POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

(সূরা আনফাল: ২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 4

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 25 Jan, 2024 13 রজব 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমান- এ ১২৮তম সালানা জলসা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল।

এই যুগ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের যুগ। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, কুরআন করীম এবং হযরত আকদস মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) যাঁর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

সমস্ত দেশে জলসাসমূহের আয়োজন, সসম্মানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নাম উচ্চারণ করা,তাঁর নামে জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা- এগুলি সবই সেই ঐশী প্রতিশ্রুতির সত্যতার প্রমাণ যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবং আঁ হযরত (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর দাসত্বে আগমণ করেছেন।

কাদিয়ান জনপদটি একশ' বছর পূর্বে এক অখ্যাত গ্রাম ছিল যা আজ এক সুন্দর শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। এই খ্যাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নামের কারণে, তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির কারণে। আজ এই জনপদে পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে।

আল হামদোলিল্লাহ। বুস্তানে আহমদ এর বিরাট প্রাঙ্গণে গত ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ সালের সালানা জলসা কাদিয়ান অনুষ্ঠিত হল। সারা দেশের আহমদীয়াতের অনুরাগীরা উৎসাহ উদ্দীপনাসহকারে জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসার ক্রমশ এগিয়ে আসতেই কাদিয়ান দারুল আমান নবরূপে সেজে উঠতে থাকে আর অতিথিগণের সমাবেশ বাড়তে থাকে। যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদেরকেই চোখে পড়ে। বিদেশ থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অতিথি জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর এইরূপে কাদিয়ান দারুল আমান আনন্দ ও লাবন্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অতিথিদের আনাগোনার পূর্বেই বিদ্যুত ও আলোকসজ্জা বিভাগের পক্ষ থেকে কাদিয়ানের অলি-গলি এবং রাস্তাঘাট টিউব লাইট আলোকে ঝকঝকে হয়ে উঠে। বেহিস্তি মাকবারা, দারুল মসীহ, মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকসা, মিনারাতুল মসীহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে রঙীন আলোকে সাজিয়ে তোলা হয়। এইরূপে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই পবিত্র ভূমি আধ্যাত্মিকভাবে এবং বাহ্যিকভাবেও আলো ঝলমল হয়ে ওঠে।

কর্মী ও প্রস্তুতি নিরীক্ষণ

২৫শে ডিসেম্বর ২০২৩ সোমবার বেলা সাড়ে দশটায় জলসা গাহ বুস্তানে আহমদ এ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের সদর মাননীয় মৌলানা মহম্মদ করীমুদ্দীন শাহিদ সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার কর্মী ও প্রস্তুতি নিরীক্ষণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি নিজের ভাষণে তিনি আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবাগণের আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। ভাষণের শেষে তিনি জলসার সার্বিক সাফল্য এবং কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য সমবেত দোয়া করান।

২৯ শে ডিসেম্বর, ২০২৩

উদ্বোধনী অধিবেশন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৩ রোজ পবিত্র জুমার দিন মৌলানা মহম্মদ করীমুদ্দীন শাহিদ সাহেবের সভাপতিত্বে জলসা সালানা কাদিয়ান জামাতীয় ঐতিহ্য মেনে বেলা ১০টায় আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি ১০:০৪টায় আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করান। প্রথম অধিবেশনের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান এর শিক্ষক মাননীয় মুরশিদ আহমদ ডার সাহেব সূরা আলে ইমরানের ১৯১-১৯৫ নং আয়াতের তিলাওয়াতের করেন। নাজিম দারুল কাযা মাননীয় জয়নুদ্দীন হামিদ সাহেব তিলাওয়াত কৃত আয়াতসমূহের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর সভাপতি মহাশয় বক্তব্য রাখেন। তিনি সর্বপ্রথম জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দকে জলসার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাণীর আলোকে শ্রোতাদের সামনে কতিপয় উপদেশ তুলে ধরেন। বক্তৃতা শেষে তিনি দোয়া করান।

প্রথম দিন প্রথম অধিবেশন

এরপর মাননীয় তানভীর আহমদ নাসের সাহেব, নায়েব নাযির নশর ও ইশাআত কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখে মাননীয় মৌলানা হামীদ কাউসার সাহেব,নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ॥ তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব।

দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব, নাযের সাহেব আলা ও আমীর জামাত আহমদীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী- খুতবা হজ্জাতুল বিদা-র আলোকে। (মানুষের সমানাধিকার)

প্রথম দিন দ্বিতীয় অধিবেশন।

দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা দুটোর সময় আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় রফিক আহমদ সাহেব মালাবারী, উকিলুল আলা তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান। দস্তরমত কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। মাননীয় হাফিয উমায়ের আব্বাস নায়েক সহেব, মুরুব্বী সিলসিলা সূরা আনফালের ২০-২৫ নং তিলাওয়াত করেন। এরপর মাননীয় ডক্টর জাভেদ ইকবাল সাহেব নাযির দিওয়ান তিলাওয়াতকৃত আয়াতের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর সাঈদ আহমদ মালকানা মুরুব্বী সিলসিলা হযরত মসীহ

এরপর শেষ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

এটি খোদার নবীর মর্যাদা পরিপন্থী যে, তিনি অস্ত্র ধারণ করার পর তা আবার খুলে রাখবেন, (তবে,) খোদা কোনো সিদ্ধান্ত দিলে সেটি ভিন্ন কথা'। অতএব, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে চলো, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, খোদার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।

খোদার নবী বর্ম পরিধান করার পর তা আর খুলেন না। এখন যাই হোক না কেন আমরা সম্মুখেই অগ্রসর হবো। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে তোমরা খোদার সাহায্য লাভ করবে।

আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য নিব না।

মু'মিন সকল মু'মিনের মাঝে এমন যেমন টি দেহের সাথে মাথা থাকে। মাথায় ব্যাথা হলে সারা দেহ এর ফলে ব্যাথা অনুভব করে।

আল্লাহর ভাণ্ডারে যা আছে বান্দা কেবল তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই তা লাভ করতে পারবে।

নিঃসন্দেহে মতবিরোধ ও ঝগড়া, পরাজয় এবং দুর্বলতার লক্ষণ। আল্লাহতা'লা এগুলো অপছন্দ করেন। আমি তোমাদের যে কাজের নির্দেশ প্রদান করি তা তোমাদের জন্য করা আবশ্যক কেননা আমি মরিয়া হয়ে চাই যে তোমরা হিদায়াত পাও।

তোমরা জিহাদের ওপর ধৈর্য্য ধারণ করে নিজেদের কর্মের সূচনা কর এবং এর মাধ্যমে আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুতি সন্ধান কর।

আজ যদি মুসলমানেরা এই কথাগুলি স্মরণ রাখে তবে শত্রুরা তাদের প্রতি চোখ তুলে দেখার সাহস পাবে না।

ফিলিস্তিনীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে দোয়ার আবেদন যাচ্ছি, তাদের জন্য দোয়া করবেন।

সম্প্রতি যুদ্ধবিরতি শেষ হবার পর যা ধারণা করা হয়েছিল, ঠিক তা-ই হচ্ছে। ইসরায়েল সরকার পূর্বের তুলনায় ভয়াবহভাবে গাজার প্রত্যেকটি অঞ্চলে বোমা বর্ষণ এবং আক্রমন করে চলেছে। নিষ্পাপ শিশু এবং নিরপরাধ নাগরিক শহীদ হচ্ছে। বাকি থাকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ। তাদের আওয়াজে কিছুটা শক্তি দেখা যাচ্ছে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সবাই এক হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা না করবে ততদিন কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের মাঝেও ঐক্য সৃষ্টি করে দিন।

আল্লাহ্ করুন, মুসলমান যেন এক হয়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করার পরিবর্তে জগত থেকে অত্যাচারের অবসান ঘটানোর মাধ্যম হয়।

এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমাদের দোয়ার পাশাপাশি, পূর্বেও আমি জামা'তের মাধ্যমে বাণী পাঠিয়েছিলাম যে, আপনাদের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের এই অত্যাচারের অবসানের জন্য আওয়াজ তুলতে নিয়মিত মনোযোগ আকর্ষন করা উচিত। এমনিভাবে নিজ গণ্ডিতে পরিচিতদের মাঝে এ কথা প্রচার করুন যে, এই অত্যাচারের অবসানের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিষ্পাপ এ লোকদেরকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।

মাননীয় আব্দুল হাকীম আকমল সাহেব মরহুম মুবাল্লিগ সিলসিলা (হল্যাণ্ড) -এর স্ত্রী এবং মাস্টার আব্দুল মজীদ সাহেব (শিক্ষক, তালিমুল স্কুল হাইস্কুল, রাবোয়া) এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৮ ডিসেম্বর , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (৮ফাতাহ, ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবায় উহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সংক্ষেপে যা বর্ণনা করেছেন (এখন) সেটি তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, কাফের সৈন্যরা বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার সময় এই ঘোষণা করে যে, আগামী বছর আমরা পুনরায় মদিনায় আক্রমণ করব আর মুসলমানদের কাছ থেকে নিজেদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিব। অতএব এক বছর পর তারা পুনরায় পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করে। মক্কাবাসীদের ক্রোধের চিত্র এই ছিল যে, বদরের যুদ্ধের পর তারা ঘোষণা করেছিল, মৃত স্বজনদের জন্য কেউ কাঁদতে পারবে না। যে বাণিজ্যিক কাফেলা আসবে এর উপার্জিত লভ্যাংশ আগামী যুদ্ধের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। অতএব বেশ প্রস্তুতির পর তিন হাজারের অধিক সৈন্যের একটি বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনায় হামলা করে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, আমাদের কি শহরের ভেতরে অবস্থান করে মোকাবিলা করা উচিত নাকি বাইরে গিয়ে। তাঁর (সা.) নিজের মত এটিই ছিল যে, শত্রুকে আক্রমণ করতে দেওয়া উচিত যেন যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্যও তারাই দায়ী থাকে আর মুসলমানরা ঘরে থেকে সহজেই এর মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু সেসব যুবক শ্রেণির মুসলমান যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়নি আর যাদের হৃদয়ে আক্ষেপ ছিল যে, হায় আমরাও যদি খোদার পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ পেতাম! তারা জোর দিয়ে বলে যে, আমাদেরকে শাহাদাত থেকে কেন বঞ্চিত রাখা হচ্ছে? অতএব তিনি (সা.) তাদের কথা মেনে নেন।

পরামর্শ গ্রহণের সময় তিনি (সা.) নিজের একটি স্বপ্নও শোনান। তিনি (সা.) বলেন, স্বপ্নে আমি কয়েকটি গাভী দেখেছি। আর আমি দেখেছি যে, আমার তরবারির প্রান্ত ভেঙে গেছে। আর আমি এ-ও দেখেছি যে, সেসব গাভী জবাই করা হচ্ছে। এরপর দেখি, আমি আমার হাত একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বর্মের ভেতরে ঢুকিয়েছি। আর আমি আরও দেখেছি যে, আমি একটি ভেড়ার পিঠে আরোহিত আছি। সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এসব স্বপ্নের কী অর্থ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, গাভীর জবাই হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, আমার কতিপয় সাহাবী শহীদ হবেন। আর তরবারির ফলা ভেঙে যাওয়ার অর্থ হলো, আমার প্রিয়দের মাঝ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি শহীদ হবেন অথবা হয়ত আমারই এই অভিযানে কোনো ক্ষতি হবে। আর বর্মে হাত ঢুকানোর ব্যাখ্যা আমি এটি মনে করি যে, আমাদের মদিনায় অবস্থান করা অধিক সমীচীন হবে। আর ভেড়ায় আরোহনের ব্যাখ্যা সম্ভবত এটি হবে যে, কাফেরদের সেনাপতির ওপর আমরা বিজয়ী হব অর্থাৎ তাকে আমরা পরাজিত করব। অর্থাৎ সে মুসলমানদের হাতে নিহত হবে।

যদিও এই স্বপ্নে মুসলমানদের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের মদিনায় অবস্থান করাই উত্তম, কিন্তু যেহেতু স্বপ্নের ব্যাখ্যা মহানবী (সা.)-এর নিজের ছিল এলহাম ভিত্তিক ছিল না, তাই তিনি (সা.) সংখ্যা গরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ করেন আর লড়াইয়ের জন্য বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৭-২৪৮)

স্বপ্নে বিভিন্ন ইঙ্গিত থেকে থাকে। একথার বরাত টেনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন রূপক বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন,

"রূপক বিষয়াদি যা মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন দিব্যদর্শন ও স্বপ্নে বিদ্যমান, সেগুলো হাদীস পাঠকারীদের কাছে সুপ্ত ও গোপন নয়। কখনো দিব্যদর্শনে মহানবী (সা.) নিজের উভয় হাতে দুটি স্বর্ণের কঙ্কণ পরিহিত দেখেছেন আর এর অর্থ গ্রহণ

করা হয়েছে দুজন মিথ্যাবাদী যারা নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছিল। আর কখনো মহানবী (সা.) তাঁর সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনে কিছু গাভী জবাই হতে দেখেছেন। এর অর্থ ছিল সেসব সাহাবী যারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত অন্য নবীদের বিভিন্ন দিব্যদর্শনেও দেখা যায় । অর্থাৎ বাহ্যত তাদের কাছে কিছু দেখানো হয়েছে আর আসলে তার অর্থ ছিল ভিন্ন। তাই নবীদের কথায় রূপক ও আলঙ্কারিকতার উপস্থিতি বিরল কোনো বিষয় নয়।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৩, টিকা)

যাহোক যখন বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। আর তিনি নিজেও যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ যে, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে স্বপ্নের কারণে শহরের বাহিরে গিয়ে লড়াই করা পছন্দ ছিল না। কিন্তু লোকেরা যখন অনবরত জোর দিতে থাকে তখন তিনি (সা.) তাদের সাথে সহমত হন। তিনি জুমুআর নামায পড়ান আর মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। আর তাদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা পুরো মনপ্রাণ দিয়ে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে সুসংবাদ দেন যে, মানুষ যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিজয় ও সফলতা দান করবেন। এরপর তিনি মানুষকে নির্দেশ দেন যেন তারা গিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মানুষ এই নির্দেশ শুনে আনন্দিত হয়। এরপর তিনি (সা.) সবার সাথে আসরের নামায পড়েন। ততক্ষণে তারাও একত্রিত হয়ে যায় যারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে এসেছিল। এরপর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের সাথে নিজের ঘরে যান। তারা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর পাগড়ি বাঁধেন আর তাঁকে যুদ্ধের পোশাক পরিয়ে দেন। এরপর মানুষ তাঁর অপেক্ষায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের মানুষকে বলেন, তোমরা বাহিরে গিয়ে লড়াই করার জন্য মহানবী (সা.)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য করেছো। তাই এখনও এই বিষয়টিকে তঁ ার (সা.) হাতে ছেড়ে দাও। তিনি (সা.) যে নির্দেশই দিবেন আর তাঁর মত যা হবে তোমাদের জন্য তাতেই মঙ্গল নিহিত থাকবে। তাই তাঁর (সা.) আনুগত্য করো। মহানবী (সা.) যখন বাহিরে আসেন তখন তিনি যুদ্ধের পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি দুটো বর্ম পরিহিত ছিলেন, অর্থাৎ একটির ওপর আরেকটি বর্ম ছিল। এগুলো ছিল 'যাতুল ফুযূল' এবং 'ফিযা' নামক বর্ম। আর 'যাতুল ফুযূল' ছিল সেই বর্ম যা হযরত সা'দ বিন উবাদা তাঁকে তখন প্রেরণ করেছিলেন যখন তিনি (সা.) বদরের যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিলেন। আর এটিই ছিল সেই বর্ম যা তাঁর মৃত্যুর সময় এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত বর্মটি ছাড়িয়ে এনেছিলেন। অর্থাৎ তাকে অর্থ দিয়ে সেটি ফিরিয়ে আনেন। মহানবী (সা.) তাঁর পার্শ্বদেশে তরবারি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আর পেছনে তূণ লাগিয়ে রেখেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে অনুসারে তিনি 'সাকাব' নামক নিজের ঘোড়ায় আরোহন করেন,ধনুক ঝুলান আর বর্শা হাতে নেন। যাহোক হতে পারে এই উভয় ঘটনা ঘটেছে, বিভিন্ন মানুষ তা দেখেছে। মহানবী (সা.) যখন নিজের ঘর থেকে বাহিরে আসেন তখন তিনি অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। তখন তাকে এই সংবাদ প্রদান করা হয় যে, মালেক বিন আমর নাজ্জারী মৃত্যু বরণ করেছেন আর তার মৃতদেহ জানাযার স্থানে রাখা হয়েছে। তিনি (সা.) যাওয়ার পূর্বে তার জানাযা পড়ান। লোকেরা তাঁর সমীপে তখন নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আপনার মতামতের বিরোধিতা করা বা আপনাকে বাধ্য করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আপনি যা যুক্তিযুক্ত বা সঠিক মনে করেন সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন। এক রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, আপনি যদি শহরের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করা পছন্দ না করেন তাহলে (আমরা) এখানেই অবস্থান করি। তিনি (সা.) বলেন, 'নবীর জন্য এটি বৈধ নয় যে, তিনি অস্ত্র ধারণের পর সেই সময় পর্যন্ত তা নামিয়ে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এবং তাঁর শত্রুদের মাঝে মীমাংসা করে না দেন'।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮-২৯৯) (সুবুলুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৬)

আরেক রেওয়ায়েতে এর পরিবর্তে এই বাক্য রয়েছে যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত সে যুদ্ধ না করে'।

মহানবী (সা.)-এর প্রস্তুতি এবং সাহাবীদের ভুলের অনুশোচনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে, তিনি (সা.) গৃহাভ্যন্তরে যান আর সেখানে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)'র সাহায্যে তিনি পাগড়ী বাঁধেন এবং (যুদ্ধ) পোশাক পরিধান করেন। এরপর যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাইরে আসেন। কিন্তু ইত্যবসরে কতক সাহাবীর বোঝানোর ফলে যুবকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন যে, মহানবী (সা.)-এর মতের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের মতের ওপর জোর দেওয়া উচিত হয়নি। তাদের যখন এই বোধদয় ঘটে তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। তারা যখন মহানবী (সা.)-কে সশস্ত্র হয়ে এবং দু'টি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখেন তখন তাদের অনুশোচনা আরো বেড়ে যায়। আরা তারা সবাই একবাক্যে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমরা আপনার মতের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামতের ওপর জোর দিয়েছি। আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবেই পদক্ষেপ নিন। ইনশাআল্লাহ্ এতেই কল্যাণ হবে। তিনি (সা.) বলেন, 'এটি খোদার নবীর মর্যাদা পরিপন্থী যে, তিনি অস্ত্র ধারণ করার পর তা আবার খুলে রাখবেন, (তবে,) খোদা কোনো সিদ্ধান্ত দিলে সেটি ভিন্ন কথা'। অতএব, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে চলো, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, খোদার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮৫-৪৮৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) যখন বাইরে আসেন তখন যুবকদের অনুশোচনা হয় তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার পরামর্শই সঠিক। মদীনার (অভ্যন্তরে) থেকেই আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, 'খোদার নবী বর্ম পরিধান করার পর তা আর খুলেন না। এখন যাই হোক না কেন আমরা সম্মুখেই অগ্রসর হবো। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে তোমরা খোদার সাহায্য লাভ করবে।" (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৮)

যাহোক, ইসলামী সেনাদলের যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) একহাজার সৈন্য সাথে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যতা লি ইবনে হিশাম, ৩য় ভাগ, পৃ: ৪৪৮)

মহানবী (সা.) তখন তিনটি বর্শা বা বল্লম নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং এর ওপর তিনটি পতাকা বাঁধেন। অওস গোত্রের পতাকা দেন উসায়েদ বিন হুযায়ের এর হাতে, খাযরাজ গোত্রের পতাকা তুলে দেন হুব্বাব বিন মুনযের এর হাতে, কিন্তু কেউ কেউ বলেন, সা'দ বিন উবাদাকে দিয়েছেন। মুহাজিরদের পতাকা দেন হযরত আলী (রা.)'র হাতে। আর মদীনায় যারা রয়ে গেছেন তাদের নামায পড়ানোর জন্য ইবনে উম্মে মাকতুমকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

এরপর মহানবী (সা.) নিজের ঘোড়া 'সাকেব' এর ওপরে আরোহণ করেন, কামান গলায় ঝোলান এবং বর্শা হাতে তুলে নেন। রেওয়ায়েতে অনুসারে, উহুদের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কাছে দু'টি ঘোড়া ছিল, একটি ঘোড়া ছিল মহানবী (সা.)-এর কাছে, যার নাম ছিল, 'সাকেব'। আর দ্বিতীয় ঘোড়াটি ছিল হযরত আবু বুরদা (রা.)'র কাছে, যার নাম ছিল 'মুলাবে'। আর মুসলমানরাও অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে একশ'জন ছিলেন বর্ম পরিহিত। আর দুই সা'দ অর্থাৎ সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন উবাদা তাঁর সম্মুখভাবে দৌড়াতে থাকেন। তারা উভয়ে বর্ম পরিহিত ছিলেন আর বাকি লোকেরা তাঁর ডানে -বামে ছিল।

মহানবী (সা.) সানীয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর এক বিশাল সসস্ত্র সৈন্যদল দেখেন। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝংকার শোনা যাচ্ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? সাহাবীরা উত্তর দেন, এরা ইহুদীদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের মিত্র। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে কী? উত্তরে বলা হয়, না। তখন তিনি বলেন, আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য নিব না। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৬) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮০)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাদলের জন্য তিনটি পতাকা প্রস্তুত করান। অওস গোত্রের পতাকা উসাইদ বিন হুযায়র এর হাতে তুলে দেন, খাযরাজ গোত্রের পতাকা হুব্বাব বিন মুনযেরের হাতে এবং মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করা হয়, পরবর্তীতে এই পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে দেওয়া হয়েছিল। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুমকে মদীনায় ইমামুস্ সালাত নিযুক্ত করে তিনি (সা.) সাহাবীদের এইট বড় দল নিয়ে আসরের নামাযের পর মদীনা থেকে যাত্রা করেন। অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতৃদ্বয়, সা'দ বিন মু'আয এবং সা'দ বিন উবাদা তাঁর বাহনের সামনে ধীরগতিতে দৌড়াচ্ছিলেন আর অন্যান্য সাহাবীরা তার ডানে, বামে ও পেছনে হাঁটছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮৬) (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৮)

মহানবী (সা.) রওয়ানে হয়ে শায়খাঈন নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এটি ছিল মদীনার দু'টি পাহাড়। এখানে পেঁ ৌছে তিনি (সা.) তাঁর সৈন্যদলকে পরিদর্শন করেন এবং সেসব কিশোরকে ফেরত পাঠিয়ে দেন যাদের সম্পর্কে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, এদের বয়স এখনও ১৫ বছর হয়নি অথবা যারা ১৪ বছর বয়সের ছিল।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০০)(সুবুলুল হুদা , উর্দু অনুবাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৫)

ইমাম শাফী লিখেছেন করেছেন যে, তিনি ১৪ বছর বয়স্ক সেই ১৭জন বালককে ফেরত পাঠিয়ে দেন যাদেরকে তার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল আর যখন তার সামনে ১৫ বছরের ছেলেদের উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন।

স্বল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে যাদেরকে ফেরত পাঠানো হয় আর যারা তেজোদীপ্ত বালক ছিল তাদের কতকের নামও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে দেখা যায়। তারা হলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন আরকাম, বারা' বিন আযেব, উসাইদ বিন যুহায়ের, আরাবা বিন অওস, আবু সাইদ খুদরী, অওস বিন সাবেত, সা'দ বিন বহীর, ইবনে মুআবিয়া বাজলী, সাঈদ বিন হাবতা (হাবতা তার মায়ের নাম ছিল), সা'দ বিন উকায়েব, যায়েদ বিন জারিয়া, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্। (এই জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ তিনি নন যার

বরাতে বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে, ইনি অন্য একজন,) রাফে' বিন খাদীজ এবং সামরা বিন জুনদুব।

রাফে' বিন খাদীজ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে বলা হয় যে, সে তীরন্দাজ। তখন তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। {প্রথমে তাকে বলা হয়েছিল, ফেরত যাও, কিন্তু যখন জানা গেল, সে দক্ষ তীরন্দাজ তখন তিনি (সা.) তাকে অনুমতি দেন।}

তখন সামরা বিন জুনদুব বলেন, মহানবী (সা.) রাফে' বিন খাদীজকে অনুমতি দিয়েছেন আর আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, অথচ আমি মল্লযু দ্ধে তাকে ধরাশায়ী করতে পারি। মহানবী (সা.) এ বিষয়টি অবগত হলে বলেন, তোমরা উভয়ে মল্লযুদ্ধ করো। মল্লযুদ্ধে সামরা রাফে'কে ধরাশায়ী করে। তখন তিনি (সা.) তাকেও অনুমতি প্রদান করেন। এরপর রেওয়ায়েতে আরো উল্লে খ আছে, মহানবী (সা.) যখন সেনাদল পরিদর্শন করা শেষ করেন এবং সূর্য ডুবে গেল তখন হযরত বেলাল (রা.) মাগরিবের আযান দেন এবং মহানবী (সা.) নামায পড়ান। অতঃপর এশার আযান দেন এবং তিনি (সা.) এশার নামায পড়ান এবং শায়খাঈন নামক স্থানে এই রাত অতিবাহিত করেন। আর এই রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)- কে নিগরাণ বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি পঞ্চাশ জনকে সাথে নিয়ে সেনাদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তিনি (সা.) বলেন, আজ রাত আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে কে থাকবে? অর্থাৎ গোটা সৈন্যবাহিনীর এবং মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কে পালন করবে? তখন যাকওয়ান বিন আবদে কায়েস (রা.) দাঁড়ালেন; বর্ম পরিধান করলেন, নিজের চামড়ার ঢাল হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) কে পাহারা দিতে লাগলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর থেকে পৃথক হন নি। রসূলুল্লাহ (সা.) সেহরীর সময় পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে প্রভাতে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি ফিরিশতারা হযরত হামযাকে (রা.) গোসল দিচ্ছে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০০)

এই ব্যাপারে 'সীরাতে খাতামান্নাবিঈন' গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, "উহুদ পাহাড় মদীনার উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর অর্ধেক দূরত্বে পৌঁছে শায়খায়ন নামক স্থানে তিনি (সা.) যাত্রা বিরতি দিলেন এবং ইসলামী সেনাদল সম্পর্কে একটি জরিপ করার আদেশ দিলেন। অল্প বয়স্ক কিশোররা যারা জিহাদের আগ্রহে সাথে এসেছিল তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহ বিন উমর, উসামা বিন যায়েদ, আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু তা'লা আনহুম) প্রমুখ সবাইকে ফেরত পাঠানো হয়। রাফে' বিন খাদিজ (রা.) এসব কিশোরদের সমবয়সী ছিলেন, কিন্তু তির নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। তার এই দক্ষতার কারণে তার পিতা মহানবী (সা.) এর সকাশে তার পক্ষে সুপারিশ করলেন যেন তাকে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) রাফে'র দিকে চোখ তুলে তাকালেন তখন তিনি সৈনিকদের মতো সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যেন তাকে লম্বা ও সবল মনে হয়। তার এই কৌশল কাজে আসলো, মহানবী (সা.) তাকে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এতে আরেক কিশোর সামারা বিন জুনদব (রা.) যেভাবে এখনই বর্ণনা করা হলো তাকে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে নিজের পিতার কাছে গিয়ে বলে, যদি রাফে'কে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমাকেও অনুমতি দেওয়া উচিত। কেননা আমি রাফে'র চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং তাকে কুস্তিতে ধরাশায়ী করে ফেলি। পুত্রের নিষ্ঠায় পিতা যারপরনায় আনন্দিত হলেন এবং তাকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিজের পুত্রের বাসনা ব্যক্ত করলেন।

মহানবী (সা.) হেসে বললেন, ঠিক আছে রাফে' এবং সামারা'র কুস্তি করাও যেন কে বেশি শক্তিশালী সেটা জানা যায়। কুস্তি হলো এবং বাস্তবেই সামারা চোখের পলকে রাফে'কে কুপোকাত করলেন। এতে মহানবী (সা.) সামারা'কেও সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন আর এই নিষ্পাপ কিশোরের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল।

এখন যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল এজন্য বেলাল (রা.) আযান দিলেন এবং সব সাহাবী মহানবী (সা.) এর ইমামতিতে নামায পড়লেন। রাতের জন্য মুসলমানরা এখানেই শিবির স্থাপন করলো। মহানবী (সা.) রাতের পাহারার জন্য মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে (রা.) দায়িত্ব অর্পন করলেন, তিনি পঞ্চাশজন সাহাবীর একটি দলকে নিয়ে সারারাত ইসলামী সেনাদলের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে পাহারা দিলেন। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৮৬-৪৮৭)

আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল প্রথমে সাথে এসেছিল কিন্তু রাস্তায় ফেরত চলে গিয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, সেহরীর সময় মহানবী (সা.) শায়খায়ন নামক স্থান থেকে যাত্রা করলেন এবং মদীনা ও উহুদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী শওত নামক স্থানে পৌঁছে নামাযের সময় হয়ে গেল এবং এই স্থানে তিনি (সা.) ফজরের নামায আদায় করলেন। শওত কিনাহ্ উপত্যকা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। এই স্থানেই আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল নিজের মুনাফিক সঙ্গীদের সাথে মহানবী (সা.) এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়। তার সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল তিনশ যারা সবাই মুনাফিক ছিল। ফেরত আসার সময় আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলতে লাগলো, তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) আমার কথা মানেন নি, বরং কম বয়স্ক বালকদের কথা মেনেছেন। ছেলে ছোকরাদের কথায় এসে যান যাদের মতামত কোন মূল্যই রাখে না। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বললো, আমরা জানি না কিসের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিবো? এজন্য হে লোকসকল! চল আমরা ফিরে যাই। মুনাফেকদের নেতার এই নির্দেশে তার মুনাফেক সাথীরা মুসলমানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ফেরত চলে যায়। তাদেরকে যেতে দেখে হযরত জাবের (রা.)'র পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর মতোই খাযরাজ গোত্রের একজন বড় নেতা ছিলেন, তিনি সেই পলায়নরত মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এটি কি তোমাদের জন্য সমীচীন যে তোমরা ঠিক এই মুহূর্তে নিজ নবী ও নিজ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছ, যখন কিনা শত্রুরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাদের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান! এই কথা শুনে তারা বললো, আমরা যদি জানতাম যে তোমরা যুদ্ধ করার জন্য এসেছো তাহলে তো আমরা তোমাদের সাথেই আসতাম না। আমরা তো ভেবেছিলাম কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না। এভাবে তারা স্পষ্টভাবে যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দিল। অথচ তারা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য এসেছিল। তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বললেন 'হে আল্লাহ্র শত্রুরা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন, অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীকে তোমাদের অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।'

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে আল্লামা ইবনে জওযী লিখেছেন, 'যখন বনু সালামা ও বনু হারেসা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখলো তখন তারাও ফিরে যেতে মনস্থ করে। এই দুটি গোত্র সেনাবাহিনীর দুটি বাহুতে (দুই উইং) ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা গোত্র দুটিকে এই পাপ থেকে রক্ষা করলেন আর তারা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল করেন- إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (আলে ইমরান : ১২৩) অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্য থেকে দুটি দল ভীরুতা প্রদর্শন করার মনস্থ করলো অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাদের উভয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আল্লাহ্ তা'লার উপরেই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত'।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার তিনশত সঙ্গীর এই বিশ্বাসঘাতকতার পর রসূল করীম (সা.)-এর সাথে শুধুমাত্র সাতশত লোক অবশিষ্ট রইলো।

এদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই যখন ফিরে গেল তখন আনসারগণ রসূল করীম (সা.) কে বললেন 'হে আল্লাহ্র রসূল! ইহুদীদের মধ্যে যে সকল লোক আমাদের সাথে মিত্র ও আমাদের সমর্থক আমরা কি এই মুহূর্তে তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারি না? এর দ্বারা তারা মদীনার ইহুদিদের বুঝিয়েছে আর তাদের মধ্যে হয়তো বনু কুরায়যার ইহুদিদের কথা বলছিলেন। কেননা বনু কুরায়যার ইহুদীরা হযরত সা'দ বিন মুআ'য (রা.)-এর মিত্র ছিল। আর হযরত সা'দ বিন মুআ'য (রা.) অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত সা'দ সম্পর্কে অনেক আলেম এই মন্তব্য করেছেন, আনসারদের মধ্যে তার অবস্থান ও পদমর্যাদা তেমনই ছিল যেমন মুহাজেরগণের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা ছিল। যাহোক আনসারদের এই প্রশ্নের উত্তরে রসূল করীম (সা.) কেবল এতটুকুই বললেন, 'আমাদের তাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই'।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১৬৭)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন- দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ তিন হিজরী সনের পনেরো শাওয়াল তথা ৩১ শে মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সেহ্রীর সময় ইসলামী সেনাবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং পথিমধ্যে নামায আদায় করে ভোর হতেই উহুদের পাদদেশে পৌঁছে যায়। এই সময়ে বক্র প্রকৃতির লোক মুনাফেকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতা করে আর নিজের তিনশত সঙ্গী নিয়ে মুসলমান সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে এই কথা বলে মদীনার উদ্দেশ্যে ফেরত রওয়ানা হয়, 'মুহাম্মদ (সা.) আমার কথা মানেন নি আর অনভিজ্ঞ যুবকদের কথা য় (যুদ্ধ করতে) বাহিরে এসেছেন, তাই আমি তাঁর সাথে মিলে যুদ্ধ করতে পারবো না।' কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে এই বিশ্বাসঘাতকতা ঠিক নয়। কিন্তু সে কারো কথা বলতে থাকে যে, এটি যদি কোন যুদ্ধ হতো তাহলে আমি তাতে অংশ নিতাম। কিন্তু এটি কোন যুদ্ধই না বরং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।

এরফলে ইসলামী সৈন্যবাহিনীতে কেবল সাত'শ সদস্য রয়ে যায় যা কাফেরদের তিন হাজার সৈন্যের বিপরীতে এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল আর বাহন ও যুদ্ধসামগ্রীর দিক থেকেও ইসলামী সৈন্যবাহিনী কুরাইশ বাহিনীর তুলনায় নিতান্ত দুর্বল ও তুচ্ছ ছিল, কেননা মুসলমান বাহিনীতে কেবল একশ বর্মধারী ও মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। এর বিপরীতে কাফেরদের সৈন্যবাহিনীতে সাতশো বর্মধারী, দু-শো ঘোড়া এবং তিন হাজার উট ছিল।

এই দুর্বলতার মাঝে যা মুসলমানরা ভালোভাবে অনুভব করছিল- আব্দুল্লাহ্ বিন আবি-র তিনশো মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা কতক দুর্বলচিত্ত মুসলমানের হৃদয়ে এক অস্থিরতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং তাদের মাঝে কেউ কেউ দোদুল্যমান হতে থাকে। যেমন কুরআন মজীদেও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এই অস্থিরতা

ও উদ্বেগের মধ্যে মুসলমানদের দুটি গোত্র বনু হারেসা ও বনু সালামা মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে ফেলে কিন্তু হৃদয়ে যেহেতু ঈমানের জ্যোতি বিদ্যমান ছিল তাই পুনরায় সামলে ওঠে এবং বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে মৃত্যুকে সামনে দেখেও স্বীয় মনিবের সঙ্গ ত্যাগ করে নি।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৮৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি (সা.) এক হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং কিছুদূর গিয়েই রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে তাঁবু স্থাপন করেন। তাঁর (সা.) স্থায়ী রীতি ছিল, তিনি শত্রুর নিকট পৌঁছে নিজের সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিতেন যেন তারা নিজেদের সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নিতে পারে। ফজরের নামাযের সময় যখন তিনি (সা.) বের হন তখন তিনি বুঝতে পারেন, কতক ইহুদী তাদের সন্ধিভুক্ত গোত্রসমূহকে সাহায্য করার অজুহাতে এসেছে। তিনি (সা.) যেহেতু ইহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে জানতেন তাই তিনি (সা.) বলেন, এদেরকে ফেরত পাঠানো হোক। এতে আব্দুল্লাহ বিন আবি বিন সলূল যে কি না মুনাফিকদের নেতা ছিল- এই বলে নিজের সাথে তিনশো সঙ্গীসাথি নিয়ে ফেরত গেল যে, এখন আর এটি যুদ্ধ নয়। এটি তো ধ্বংসের মুখে যাবার নামান্তর। আব্দুল্লাহ্ বিন আবি-র ফেরত যাবার এটি আরেকটি কারণ ছিল অর্থাৎ সে বলেছিল, এই ইহুদীদের কেন অন্তর্ভুক্ত করা হবে না? এটি তো ধ্বংসের মুখে নিপতিত হবার নামান্তর, কেননা নিজেরাই নিজেদের সাহায্যকারীদের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। ফলাফলস্বরূপ, মুসলমানরা কেবল সাতশো রয়ে গেল যা কি না কাফেরদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল আর যুদ্ধসামগ্রীর দিক থেকে আরো দুর্বল, কেননা কাফেরদের মাঝে সাতশো বর্মধারী ছিল পক্ষান্তরে মুসলমানদের ছিল একশ বর্মধারী; আবার কাফেরদের মাঝে দু-শো অশ্বারোহী ছিল কিন্তু মুসলমানদের নিকট মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৮-২৪৯)

মহানবী (সা.) যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনু হারেসা উপত্যকায় পৌঁছান তখন এক সাহাবীর ঘোড়া লেজ নাড়ালে তা তার তরবারিতে গিয়ে লাগে। এতে তিনি বিপদের আশঙ্কা করে নিজের তরবারি হাতে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইতিবাচক কথাবার্তা পছন্দ করতেন আর অলক্ষুণে কথাবার্তা অপছন্দ করতেন। যার তরবারি ছিল তাকে তিনি বলেন যে তরবারি খাপে ঢুকিয়ে রাখো, কেননা আমার মনে হয় আজকে তরবারি ধারণ করা হবে।

(আসসীরাতুল নবুয়্যতা লি ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৮-৪৪৯)

এর অর্থ এটিই মনে হয়। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, কে আছে যে আমাদের নিকটবর্তী পথ ধরে শত্রু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। অর্থাৎ এমন পথ যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। এতে হযরত আবু খায়সামা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি নিয়ে যাব। ইবনে সা'দ প্রমুখ তার নাম আবু হাসমা বলেছেন। যাহোক, তিনি তাঁকে (সা.) বনু হারেসার বসতিস্থল, জমি ও সম্পত্তি ওপর দিয়ে মুসলমানদের সাথে করে নিয়ে যায় এমনকি উহুদ প্রান্তরে তিনি পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করেন।

তিনি (সা.) এমনভাবে শিবির স্থাপন করেন যে, উহুদ পাহাড়কে নিজের পিছনে ও মদিনাকে সম্মু খে রাখেন। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০১-৩০২)

এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন।

মুসলমানরা উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় আর শনিবার ফজরের নামাজের ওয়াক্ত ঘনিয়ে আসলে মুসলমানরা মুশরিকদের দেখতে পায়। হযরত বেলাল (রা.) আযান ও ইকামত প্রদান করেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের ফজরের নামাজ পড়ান। মুহাম্মদ বিন উমর আসলামী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়ান ও জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করে বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সে বিষয়ে ওসিয়ত করছি যা আল্লাহ্ তা'লা নিজ গ্রন্থে আমাকে ওসিয়ত করেছেন অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াদি এড়িয়ে চলার।

আজ তোমরা প্রতিদান ও পুণ্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে আছ। যে ব্যক্তি তা স্মরণ রেখেছে অতঃপর নিজেকে এ উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও আন্তরিক স্বতস্ফূর্ততার সাথে প্রস্তুত রেখেছে। এ সব বিষয়ের জন্য বা আজকে যেদিনের জন্য তোমরা বেরিয়েছ ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। কেননা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা অসাধারণ কষ্টের কাজ। খুব অল্প সংখ্যক লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়েত দান করেন তারাই এতে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে, কেননা আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর আনুগত্যকারীদের সাথে থাকেন আর শয়তান আল্লাহ্‌তা'লার অবাধ্যদের সাথে থাকে। সুতরাং তোমরা জিহাদের ওপর ধৈর্য্য ধারণ করে নিজেদের কর্মের সূচনা কর এবং এর মাধ্যমে আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুতি সন্ধান কর। আর আমি তোমাদের যে কাজের নির্দেশ প্রদান করি তা তোমাদের জন্য করা আবশ্যক কেননা আমি মরিয়া হয়ে চাই যে তোমরা হিদায়াত পাও। নিঃসন্দেহে মতবিরোধ ও ঝগড়া, পরাজয় এবং দুর্বলতার লক্ষণ। আল্লাহতা'লা এগুলো অপছন্দ করেন। কোন মতবিরোধ থাকা সমীচীন নয় আর (যে এরূপ করে) তাকে সাহায্য ও সফলতা প্রদান করেন না।

হে লোকসকল! এটি আমার হৃদয়ে প্রোথিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ তা'লা তার ও নিজের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। যে হারাম কাজ করে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অপছন্দ করেন আর যে আল্লাহর খাতিরে সে হারাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ্ তা'লা তার গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন আর যে আমার প্রতি একবার দরুদ প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ ও তাঁ র ফেরেশতারা তার জন্য দশবার রহমত প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান কিংবা কাফেরের সাথে সদাচরণ করবে, তার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার কাছে রয়েছে। সে পৃথিবীতে তা পাবে দ্রুত আর আখিরাতেও পাবে তবে কিছুটা বিলম্বে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তার জন্য জুম'আ আবশ্যক, তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা শিশু, মহিলা, অসুস্থ অথবা অধীনস্থ দাস। আর যে তাঁর উদাসীন হবে আল্লাহ্ তা'লাও তার পরোয়া করবেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের কিরূপে থাকা উচিত তিনি (সা.) সে সম্পর্কে পুরো নসীহত প্রদান করেছেন । তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন সে স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি (সা.) এমনটি করা সমীচিন মনে করলেন।

অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, আর আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্যের অধিকারী ও প্রশংসিত, আমার জানামতে যেসব আমল বা কর্ম তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তীকারী করবে আমি তোমাদেরকে সেগুলোর আদেশ দিয়ে দিয়েছি। আমার জানামতে যেসব কর্ম তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটতর করতে পারে আমি তোমাদেরকে তা থেকে বারণ করেছি।

আর রুহুল আমিন (জিবরাঈল (আ.) আমার হৃদয়ে এ ইলহাম অবতীর্ণ করেছেন যে, কোন প্রাণ তার সম্পূর্ণ রিযিক হস্তগত করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে না। তার রিযিকে কোন ঘাটতি হবে না, সে রিযিক বিলম্বেই লাভ হোক না কেন।

(অর্থাৎ আল্লাহতা'লা কর্মের প্রতিদান দেন। এখানে 'রিযিক' বলতে সর্বপ্রকার রিযিককে বুঝাচ্ছে।) সুতরাং তোমরা নিজ সৃষ্টিকর্তাকে ভয় কর ও রিযিকের সন্ধানে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। আর বিলম্বে রিযিক লাভ হওয়া তোমাদেরকে যেন এদিকে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা তা (রিযিক) আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে অনুসন্ধান করবে। সৎকর্ম, সর্বোত্তম চরিত্র, পবিত্র রিযিকের অনুসন্ধানে রত থাক কেননা আল্লাহর ভাণ্ডারে যা আছে বান্দা কেবল তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই তা লাভ করতে পারবে।

আল্লাহতা'লা তোমাদের জন্য হালাল ও হারামকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন কিন্তু এ দুটির মাঝে অনেক সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদি রয়েছে যা সম্পর্কে অনেক লোকই অনবগত, কিন্তু আল্লাহতা'লা যাকে সুরক্ষিত রেখেছেন সেই তা জানে। সুতরাং যে তা পরিত্যাগ করবে সে নিজ সম্মান ও ধর্মের সুরক্ষা বিধান করবে আর যে এগুলোতে লিপ্ত হবে অর্থাৎ মন্দ বিষয়ে জড়িয়ে যাবে তার অবস্থা সেই রাখালের ন্যায় হবে যে নিষিদ্ধ চারণভূমির নিকটে পশু চরায়। সে উক্ত চারণভূমিতে প্রবেশ করার দ্বারপ্রান্তে। আর প্রত্যেক রাজার একটি নিষিদ্ধ চারণভূমি থাকে।

শুনে রাখ! মহান আল্লাহ্ তা'লারও নিষিদ্ধ চারণভূমি হলো তাঁর হারামকৃত জিনিস। অতএব (সুস্পষ্টভাবে যা নিষিদ্ধ) তা থেকে বিরত থাকো। আর মু'মিন সকল মু'মিনের মাঝে এমন যেমন টি দেহের সাথে মাথা থাকে। মাথায় ব্যাথা হলে সারা দেহ এর ফলে ব্যাথা অনুভব করে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৯-১৯০)

এ বিষয়গুলো যদি বর্তমানে মুসলমানরা স্মরণ রাখে তাহলে কোনো শত্রুর তাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও হবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন শত্রু মক্কা থেকে যাত্রা করে মদীনায় পৌঁছায়। যুদ্ধের সেসব সরঞ্জাম যা আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে নিয়ে এসেছিল আর যেটিকে(অর্থাৎ বানিজ্যিক কাফেলাকে) বাধাগ্রস্থ করতে এবং মদিনা প্রবেশ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-কে বদর পর্যন্ত সফর করতে হয়েছিল আর যাতে কুফরির মহিমা ও দম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেই একই সাজসরঞ্জাম মুসলমানদের মোকাবেলার উদ্দেশ্যে একত্রিত করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআন নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত সাজ-সরঞ্জাম এবং তা ব্যয়কারীদের দিকে ইঙ্গিত করছে:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

(সূরা আনফাল: ৩৭) এই যুদ্ধে কুরায়েশের সাথে বনী তেহামা গোত্র এবং বনী কিনানা গোত্রও শামিল হয়। কাফের সেনাদের সংখ্যা তিন হাজারে গিয়ে উপণীত হয় আর তারা সবাই বর্ম পরিহিত ছিল এবং তাদের ঘোড় সওয়ারী ছিল সাত'শ জন আর সবাই অতিশয় দ্রুতই মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদগ্রীব ছিল। এই ছোট ছোট গোত্রসমূ হের সমন্বয়ে গঠিত এ বিশাল বাহিনী সেনাদল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার উত্তর-পশ্চিমে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে । তাদের ও মদীনা শহরের মাঝে কেবল উহুদ পাহাড়ের উপত্যকাটি ছিল। এই স্থানে প্রতিরক্ষা ব্যূহ স্থাপন করে কাফেররা মদীনাবাসীর ক্ষেত-খামার এবং বাগানসমূহ ধ্বংস করা শুরু করে। এর ফলে সাহাবাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ইসলামের জন্য আত্মভিমান প্রতিশোধে অনুপ্রাণিত করে। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে জোর দিয়ে প্রতিরোধ গড়ার অনুরোধ করেন। মহানবী (সা.) এক হাজার লোক সাথে নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হন। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই নামক এক সর্দার যে মদীনায় বসবাস করতো এবং বাহ্যত মুসলমানদের সাথী ছিল। একান্ত যুদ্ধের সময় এবং এই

সংকটময় মুহূর্তে নিজ তিনশত সঙ্গীসাথী নিয়ে মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে যায় যার ফলে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা ০১হাজার থেকে ৭০০তে পৌঁছায়। এই স্বল্পসংখ্যক লোকের মাঝে কেবল দুটি ঘোড়া ছিল কিন্তু মুজাহেদরা সাহসিকতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে আর খেজুর বাগান অতিক্রম করে উহুদ পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হয়। মুসলিম বাহিনী সারাটা রাত এই পাহাড়ের উপত্যকায় কাটিয়ে দেয়। ফজরের নামায আদায় করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হয়। ”

(ফসলুল খিতাব, ১ম ভাগ, পৃ: ১২৪-১২৫)

অর্থাৎ এসময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

ফিলিস্তিনীদের জন্য দোয়া করার বিষয়ে আমি ধারাবাহিকভাবে বলছি। দোয়া করতে থাকুন।

সম্প্রতি যুদ্ধবিরতি শেষ হবার পর যা ধারণা করা হয়েছিল, ঠিক তা-ই হচ্ছে। ইসরায়েল সরকার পূর্বের তুলনায় ভয়াবহভাবে গাজার প্রত্যেকটি অঞ্চলে বোমা বর্ষণ এবং আক্রমন করে চলেছে। নিষ্পাপ শিশু এবং নিরপরাধ নাগরিক শহীদ হচ্ছে।

এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমেরিকার কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধিও (সম্ভবত তিনি ইহুদী) বলেছেন, অনেক হয়েছে, এই যুদ্ধ বন্ধে আমেরিকার নিজ ভুমিকা পালন করা উচিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও চাপাকণ্ঠে বলছেন গোলাবারি বন্ধ হওয়া উচিত যা উত্তর-দক্ষিণে সমান তালে যে গোলাগুলি বা বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে তা বন্ধ হওয়া উচিত। পূর্বে বলছিল যে, উত্তর দিকে চলে যাও, সেখানে কিছু হবে না। এখন সেখানেও একই অবস্থা। যাহোক, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য কোনো মানবতার প্রতি সহানুভূতি দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়, আমাদের এমনটি ভাবা ভুল হবে বরং এটি তাদের নিজেদের স্বার্থে বলছে কেননা আমেরিকার নির্বাচন আসন্ন আর সেখানের যুবকরা এই প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে যে, এই যুদ্ধের যেন ইতি টানা হয়। একিভাবে আমেরিকার মুসলিম যুবকরাও চিৎকার-চেচামেচি করছে। যাহোক, এরা নিজেদের ভোট লাভের আশায় এগুলো করছে। ফিলিস্তিনী বা মুসলমানদের প্রতি তাদের কোনোরূপ সহানুভূতি নেই।

বাকি থাকল মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ। তাদের আওয়াজে কিছুটা শক্তি দেখা যাচ্ছে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সবাই এক হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা না করবে ততদিন কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের মাঝেও ঐক্য সৃষ্টি করে দিন।

অমুসলিম বিশ্ব জানে যে, মুসলমানদের মাঝে একতা নেই বরং এক দল মুসলমান অপরদল মুসলমানকে হত্যা করার চেষ্টায় রত। ইয়েমেনে কী না হচ্ছে! এমনিভাবে অন্যান্য (মুসলিম অধ্যুষিত) দেশ রয়েছে। মুসলমানদের হাতে হাজার হাজার শিশু ও নিষ্পাপ লোক মারা যাচ্ছে বরং বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ লক্ষ (মানুষ মারা যাচ্ছে)। এই বিষয়ই অমুসলিমদেরকে সাহস যোগাচ্ছে অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করলে কোনো সমস্যা নেই কেননা এরা তো নিজেরাই নিজেদেরও ওপর অত্যাচার করে। যেক্ষেত্রে মুসলমানরাই মুসলমানদের প্রাণ নিয়ে চিন্তিত নয় তাহলে শত্রু কেন অযথা চিন্তা করবে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অতি ভয়ানক সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো মুসলমান যদি অন্য কোনো মুসলমানকে হত্যা করে তবে ঘাতক জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ্ করুন, মুসলমান যেন এক হয়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করার পরিবর্তে জগত থেকে অত্যাচারের অবসান ঘটানোর মাধ্যম হয়।

ইউ.এন.ও. নিজেদের আওয়াজ কিছুটা উচ্চকিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের কথা কে শোনে! তারা বলে যে, আমরা এই করব, সেই করব কিন্তু তাদের করার কিছুই নেই। তাদের কথা কেউ শোনেও না। বড় বড় পরাশক্তিগুলো নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রতি দয়া করুন।

যাহোক, এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমাদের দোয়ার পাশাপাশি, পূর্বেও আমি জামা'তের মাধ্যমে বাণী পাঠিয়েছিলাম যে, আপনাদের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের এই অত্যাচারের অবসানের জন্য আওয়াজ তুলতে নিয়মিত মনোযোগ আকর্ষন করা উচিত। এমনিভাবে নিজ গণ্ডিতে পরিচিতদের মাঝে এ কথা প্রচার করুন যে, এই অত্যাচারের অবসানের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিষ্পাপ এ লোকদেরকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের পর আমি দুটি গায়েবানা জানাজা পড়াব। প্রথম জানাযা হল্যান্ডের অধিবাসী মুকাররমা মাসুদা বেগম আকমল সাহেবার। তিনি ছিলেন মুরব্বী সিলসিলাহ মরহুম আব্দুল হাকীম সাহেবের সহধর্মিনী। বিগত দিন তিনি ইন্তেকাল করেছেন । ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন*** । তাঁর নানা মিয়া আব্দুস সামাদ সাহেব (রা.) এবং প্রপিতামহ মিয়া ফতেহ দ্বীন সাহেব সেখওয়া (রা.) কাদিয়ানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা উভয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। মরহুমা দীর্ঘ দিন হল্যান্ডে নিজ স্বামীর সাথে ধর্ম -সেবায় নিমগ্ন ছিলেন। ১৯৫৭ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশনায় আকমল সাহেব প্রথমবার হল্যান্ড গিয়েছিলেন কিন্তু তখন তাঁর স্ত্রী সাথে ছিলেন না। মরহুমা ১৯৬৯ সালে সেখানে যান। এরপর পুনরায় ফেরত চলে আসেন, আবার ১৯৮৬ সালে হল্যান্ড যান। নিজ স্বামীর বর্হিবিশ্বে পোস্টিং থাকায় বৈবাহিক জীবনে তিনি প্রায় ১৫ বছর পৃথক থেকেছেন [অর্থাৎ একাকী জীবন-যাপন করেছেন।]

হল্যান্ড থাকাকালীন সময় সেখানকার 'লাজনা ইমাইল্লাহ্ ' প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিহলান্ডের লাজনা ইমাইল্লাহ'র প্রথম সদর হওয়ার গৌরবও লাভ করেন। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্থতার সম্পর্ক ছিল। মুত্তাকি, পরহেজগার এবং নিয়মিত নামায ও রোজায় অভ্যস্ত মহিলা ছিলেন। মরহুমা মুসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনজন পুত্রসন্তান ও একজন কন্যাসন্তান রয়েছে এবং তারা সকলেই কোনো না কোনোভাবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করে যাচ্ছেন। তাঁর এক পুত্র পূর্বে আনসারুল্লাহ্ র সদর ছিলেন, এখন অন্যজনও সম্ভবত এ বছর আনসারুল্লাহর সদর নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়াও জামা'তের অন্যান্য সেবা প্রদান করছেন। আল্লাহ্ তালা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদের তাঁর পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ওয়াকফে জীন্দেগী মাষ্টার আব্দুল মজীদ সাহেবের, তিনিও তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল রাবওয়াতে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনিও কিছুদিন পূর্বে অবসর গ্রহনের পর ইদানিং কানাডাতে বসবাস করছিলেন আর সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন । ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন***। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন পুত্র ও দু জন কন্যাসন্তান রয়েছে।

তাঁর ছেলে মাযহার মজীদ সাহেব বলেন, আমার বাবা অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খুব বিনয়ী এবং দরবেশী জীবন যাপন করেছেন। মা বলেন, বিবাহ থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁকে ফেরেশতাসুলভ মানুষ পেয়েছি। বিবাহের কয়েক বছর পর একদিন নামাযে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে দোয়া করছিলেন। নামাযের পর আমি জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কোন জিনিসের জন্য দোয়া করছেন। তখন তিনি বলেন যে, আমার আকাঙ্খা, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে সেবা করি। [পূর্বে নিজ এলাকায় অন্য কোনো কাজে নিয়জিত ছিলেন।] আমি দোয়া করছি, আল্লাহ্ যেন আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেন এবং আমার স্ত্রীকেও এ বিষয়ে সম্মত করে দেন, তাঁর মন প্রশান্ত করে দেন। যাহোক, তখন তাঁর সহধর্মিনী বলেন, আপনি দ্রুত হযরত খলীফাতুল মসীহ্'র সমীপে ওয়াকফে জীন্দেগী করার আবেদনপত্র প্রেরণ করুন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তিনি ওয়াকফে জীন্দেগী করার আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। [এটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগের কথা]। তিনি (রা.) আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন এবং তিনি (অর্থাৎ মরহুম আব্দুল মজীদ সাহেব) রাবওয়া চলে যান।

তিনি আরো বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক মাসে ভাতা পাওয়া পর প্রথমে সেক্রেটারী মালের কাছে গিয়ে চাঁদা দিতেন তারপর অবশিষ্ট অর্থ মায়ের হাতে দিতেন। রাবোয়াতে আসার পর অনেক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছেন কিন্তু কখনো কোনো অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। কখনও পার্থিব জিনিসের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন নি। ভাই-বোনদেরকে সবসময় সময়মত নামাজ আদায় করার, জামা'ত ও খেলাফতের সাথে সংযুক্ত থাকার উপদেশ প্রদান করতেন। সেই সময় জামা'তের আর্থিক অবস্থা বর্তমান যুগের মত (এতটা স্বচ্ছল) ছিল না, অনেক সংকট ছিল, তা সত্ত্বেও অনেক ধৈর্যের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

আমি যখন সেই স্কুলে পড়তাম তখন তিনি শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন। আমি নিজে দেখেছি, সত্যিই তিনি এসব গুণের অধিকারী ছিলেন। সন্তান পিতার প্রশংসা করেছে তাই আমি বলছি, বিষয় এমন নয়। তার মাঝে এই সমস্ত গুণাবলী উপস্থিত ছিল।

গায়ের আহমদীরাও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ১৯৮৫ সালে যখন সরকার তাকে প্রমোশন দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ বা ১৯৭৪ এর পর স্কুল জাতীয়করন করা হয় সেই সময় এই স্কুলে থাকাই পছন্দ করেন। কিছু কালএই স্কুলে থাকার পর ১৯৮৫ সালে প্রমোশন দিয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে ইসলামীয়া হাই স্কুল ভেরাতে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানের সহকারী প্রধান শিক্ষক যে কিনা জামে মসজিদের ইমামও ছিল, ধারণা করা হচ্ছিল যে, তিনি আহমদী হওয়ার কারণে তাঁর বিরোধিতা করবে কিন্তু তাঁর উত্তম আদর্শের কারণে তাঁকে খুব সম্মান করতো, অনেক বেশি সম্মান করতো আর তাঁর প্রতি খুব বিনয়ী ছিল।

বর্ননাকারী বলছেন, এক দিন আমি তাকে অন্য শিক্ষকদের বলতে শুনেছি, 'এই ব্যক্তি কাদিয়ানী হওয়া সত্ত্বেওফেরাশ্তাসুলভ মানুষ'। এভাবে তিনি নীরব তবলীগ করতেন এবং এর মাধ্যমে বিরোধীদের ওপরও প্রভাব সৃষ্টি করতেন। বেশিরভাগ সময় তাঁর ছাত্ররা তঁ ার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো আর বলতো আমরা আপনার ছাত্র ছিলাম কিন্তু তিনি সেই ছাত্রদের নিয়ে সবচেয়ে গৌরব অনুভব করতেন এবং তাদের উল্লেখ করতেন যারা নিজেদের জীবন খোদার পথে উৎসর্গকরেছেন। আর এ ক্ষেত্রে খুব আনন্দের সাথে বলতেন যে, ওমুক ওয়াকফে জীন্দেগী একদা আমার ছাত্র ছিল। ওয়াকফে জীন্দেগীদের অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নত করুন, তাঁর সন্তানদেরও তাঁর পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দিন, আমীন।

****

জুমআর খুতবা

কোনো সেনাপতি যত বিচক্ষণ হোক না কেন, মহানবী (সা.)-এর চাইতে অধিক সূক্ষ্ম, পরিশীলিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ রণকৌশলল রচনা করতে পারবে না।

মহানবী (সা.) তাঁর সেনাদের জন্য রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই স্থান নির্বাচন করেছিলেন যেটি যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম স্থান ছিল।

মানুষের যুদ্ধের জয়-পরাজয় তাদের পতাকাবাহকদের কারণে হয়ে থাকে। পতাকাবাহক দৃঢ় হলে মানুষের মাঝে মনোবল থাকে। যখন তারা পলায়ন করে তখন মানুষও পলায়ন করে।

মহানবী (সা.) কাকুতি-মিনতির সাথে খোদা তা'লার কাছে সবিনয়ে ও বিগলিতচিত্তে বিজয় ও সফলতার জন্য দোয়া করছিলেন।

মুশরিকদের পতাকাবাহীর নিহত হওয়া মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের সত্যায়ন ছিল যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি একটি ভেড়ায় আরোহিত।

হযরত আবু দুজানা জিজ্ঞেস করেন, এর অধিকার কী?

মহানবী (সা.) জবাবে বলেন, এটি দ্বারা কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে না এবং এটি হাতে থাকা অবস্থায় কোনো কাফেরের মোকাবেলায় পলায়ন করবে না, অর্থাৎ বীরত্বের সাথে লড়াই করবে।

'আমার মন এই বিষয়ে সায় দেয় নি যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরবারি দিয়ে একজন মহিলাকে আঘাত করব। আর মহিলাটাও এমন যার সাথে সেই সময় কোনো পুরুষ রক্ষাকারী নেই।' (হযরত আবু দুজানা)

মহানবী (সা.) সর্বদা মহিলাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিতেন, যার কারণে কাফেরদের মহিলারাও অনেক ধৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করত।

ওহদের যুদ্ধের ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং ফিলিস্তীনি নিপীড়িতদের জন্য দোয়ার আহ্বান।

ফিলিস্তিনীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন চরম রূপ ধারণ করছে। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন এবং অত্যাচারিত ফিলিস্তিনীদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। (আল্লাহ্ তা'লা) মুসলমান দেশসমূহকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারাঐক্যবদ্ধ হয় এবং মুসলমান ভাইদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৫ ডিসেম্বর, , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১৫ ফতাহ ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবন চরিতের বরাতে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) যখন উহুদের প্রান্তরে ঘাঁটি স্থাপন করেন তখন মুসলমান সেনাদলের পেছনদিকে ছিল উহুদ পাহাড়, যে কারণে মুসলমান সেনাদল পেছন হতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থেকে নিরাপদ ছিল। অবশ্য একদিকে পাহাড়ি গিরিপথ ছিল। আর এই স্থানটি এমন ছিল যে, শত্রু সুযোগ পেলে এই স্থান থেকে আক্রমণ করতে পারতো। তাই, মহানবী (সা.) এই স্পর্শকাতরতা ও আশংকা উপলব্ধি করে পঞ্চাশজন তিরন্দাজ সাহাবীর একটি দলের ওপর আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং সেই গিরিপথে মোতায়েন করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮৭)

এই তিরন্দাজদের মহানবী (সা.) যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বুখারীতে এই বাক্যাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوْا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتّٰى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوْا حَتّٰى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ -

অর্থাৎ, 'তোমরা যদি দেখো যে, পাখিরা আমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি আমার কাছ থেকে বার্তা প্রেরণ না করা পর্যন্ত তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না। পক্ষান্ত রে তোমরা যদি দেখো যে, আমরা শত্রু জাতিকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তবুও আমি তোমাদের কাছে কোনো পয়গাম না প্রেরণ করা পর্যন্ত তোমরা (স্ব-স্থান) ত্যাগ করবে না।'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস-৩০৩৯)

বুখারী শরীফেরই আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যদি দেখো আমরা তাদের ওপর জয়যুক্ত হয়েছি তথাপি তোমরা (এই) স্থান পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দেখো যে, তারা আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে তবুও তোমরা নিজেদের (স্থান থেকে) সরবে না। তোমরা আমাদের সাহায্য করতে এসো না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৪৩)

কোনো অবস্থাতেই তোমরা (এই স্থান) ত্যাগ করবে না।' একজন জীবনীকার লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শত্রুদের অশ্বারোহী দলকে আমাদের থেকে দূরে রাখবে, যেন তারা আমাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ রচনা করতে না পারে। আমাদের জয় হলেও তোমরা নিজেদের স্থানে অনড় থাকবে, যেন তারা আমাদের পেছন দিক থেকে আসতে না পারে। তোমরা নিজেদের স্থানে অটল থাকবে, সেখান থেকে সরবে না। আর তোমরা যদি দেখো যে, আমরা তাদেরকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদের সৈন্যব্যূহে ঢুকে পড়েছি তবুও তোমরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না। আর তোমরা যদি দেখো যে, আমরা নিহত হচ্ছি, তবুও আমাদের সাহায্যে (এগিয়ে) আসবে না এবং আমাদের রক্ষণাবেক্ষণও করবে না। আর তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করবে, কেননা তির নিক্ষেপের কারণে ঘোড়া সম্মু খে অগ্রসর হয় না। নিশ্চিত জেনো আমরা ততক্ষণ বিজয়ী থাকব যতক্ষণ তোমরা নিজেদের স্থানে অনড় থাকবে।' এরপর বলেন, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে এদের ওপর সাক্ষী রাখছি।'

(সুবুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯০)

একজন লেখক লিখেছেন, মহানবী (সা.) এ সময় বলেন, '(তোমরা) যদি দেখো যে, আমরা মালে গণিমত একত্রিত করছি তবুও আমাদের সাথে যোগ দিবে না। সর্বাবস্থায় আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে অবিচল থাকবে।'

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৩১)

আরেকজন জীবনীকার পঞ্চাশজন তিরন্দাজের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, যে ব্যক্তির রণক্ষেত্র দেখার এবং সেই কিনাহ্ উপত্যকার প্রান্তে অবস্থিত রোমা পর্বতের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়েছে সে মহানবী (সা.)-এর সুমহান সেই সামরিক দূরদর্শিতার কথা জানতে পারবে, যার মাধ্যমে তিনি সমর পরিকল্পনা এবং সামরিক শক্তিকে সুবিন্যস্ত করার ব্যাপক

দক্ষতা এবং যুদ্ধের জন্য সেনাদের প্রস্তুত করার সবচেয়ে উত্তম সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য যা যুদ্ধ-জয়ের জন্য আবশ্যক।

(গাযওয়ায়ে ওহদ, মহম্মদ আহমদ বাইশমাল, পৃ: ১০১-১০২)

একজন লেখক মহানবী (সা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ রণকৌশলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই রণকৌশল এত উত্তম ও পরিশীলিত ছিল যে এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সামরিক নেতৃত্বে অসাধারণ প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর প্রমাণিত হয় যে, কোনো সেনাপতি যত মেধাবীই হোক না কেন, মহানবী (সা.)-এর চাইতে অধিক সূক্ষ্ম, পরিশীলিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ রণকৌশল রচনা করতে পারবে না। রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাঁর সেনাদের জন্য রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই স্থান নির্বাচন করেছিলেন যেটি যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম স্থান ছিল।

তিনি (সা.) পাহাড়ের উচ্চতাকে প্রতিবন্ধক বানিয়ে নিজেদের পশ্চাৎ এবং ডানদিক সুরক্ষিত করে নেন এবং বাম দিক থেকে একমাত্র গিরিপথ অর্থাৎ যেই পথ দিয়ে শত্রু ইসলামী সেনাদলের পশ্চাৎভাগে পৌঁছতে পারত-সেটিকে তিরন্দাজদের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর শিবির স্থাপনের লক্ষ্যে তুলনামূলকভাবে ময়দানের উঁচু স্থানকে নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ না করুন, যদি অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয়ের শিকার হতে হয় তাহলে পলায়ন করা এবং পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হাতে আটক হওয়ার পরিবর্তে ইসলামী সেনাদল যেন নিরাপদ আশ্রয়স্থল পর্যন্ত অতি সহজেই পৌঁছতে পারে, আর শত্রু যদি সেনাব্যূহ ভেদ করে ইসলামী সেনাদলের কেন্দ্র দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তাহলে তাদের যেন ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে মহানবী (সা.) শত্রুদের উন্মুক্ত প্রান্তরে ঢালু স্থানে অবস্থান নিতে বাধ্য করেন। অথচ কুরাইশের ধারণা ছিল, ইসলামী সেনাদল মদীনা থেকে বের হয়ে একেবারে তাদের মুখোমুখি (উন্মুক্ত) প্রান্তরে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাদলকে অর্ধবৃত্তে প্রদক্ষিণ করিয়ে, শত্রুদের পশ্চিম দিকে ছেড়ে দিয়ে তাদের পেছনদিকের সুরক্ষিত স্থানকে বেছে নেন। যেস্থানে ইসলামী সেনাদল অবস্থান নিয়েছিল সেটি তখন একটি অতি উত্তম অবস্থানে ছিল। উহুদ এবং আয়নাঈন পাহাড়ের কারণে পশ্চাৎভাগ এবং ডান দিক সুরক্ষিত ছিল। বাম দিকে রোমা পাহাড়ে তিরন্দাজরা গিরিপথ আগলে রেখেছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক যেটি রোমা পর্বতের সম্মু খে ছিল, সেখানে কিনাহ্ উপত্যকার উল্লম্ব বা খাড়া প্রান্ত ছিল, সেখান থেকে শত্রুর আক্রমণ অসম্ভব ছিল।

(গযওয়াহ ওয়া সারায়া, প্রণেতা-আল্লামা মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ১৬৬-১৬৭)

এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব(রা.) ও লিখেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রতি ভরসা রেখে অগ্রসর হন এবং উহুদের প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করেন। এমনভাবে (শিবির) স্থাপন করেন যে, উহুদের পাহাড় মুসলমানদের পশ্চাৎভাগে থাকে আর মদীনা থাকে সামনে। এভাবেই তিনি (সা.) সেনাদলের পশ্চাৎভাগ সুরক্ষিত করেন। পেছনের পাহাড়ে একটি গিরিপথ ছিল যেখান থেকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। এর সুরক্ষার জন্য তিনি (সা.) আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র নেতৃত্বে ৫০জন তিরন্দাজ সাহাবীকে সেখানে মোতায়েন করেন এবং তাদেরকে তাকিদ দিয়ে বলেন, যা কিছুই হোক না কেন -তারা যেন কোনো অবস্থাতেই সেই স্থান ত্যাগ না করেন আর শত্রুর ওপর যেন উপর্যুপরি তির নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি (সা.) এই গিরিপথ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে এতটা সতর্ক ছিলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে বারংবার নির্দেশ প্রদান করেন যে, 'দেখো! এই গিরিপথ যেন কোনো অবস্থাতেই অরক্ষিত না থাকে। এমনকি তোমরা যদি দেখো যে, আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে আর শত্রুরা পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করছে তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। আর তোমরা যদি দেখো যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে আর শত্রুরা আমাদের ওপর বিজয় অর্জন করেছে তবুও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না।' এমনকি একটি রেওয়ায়েতে এই বাক্যও বিদ্যমান যে, 'তোমরা যদি পাখিদের আমাদের মাংস ছিঁড়ে খেতে দেখো তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ তোমাদেরকে এই স্থান ছেড়ে আসার নির্দেশ দেওয়া না হয়।'

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৮৭-৪৮৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে বলেন, অবশেষে তিনি (সা.) উহুদে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) একটি পাহাড়ি গিরিপথের সুরক্ষার জন্য পঞ্চাশজন সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং সেইসৈন্যদলের সেনাপতিকে তাকিদ দিয়ে বলেন, 'এই গিরিপথ এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা নিহত হই বা বিজয়ী হই- তোমরা এই স্থান থেকে নড়বে না।' এরপর তিনি বাকি সাড়ে ছয়শ সৈন্য নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলার জন্য বের হন যা শত্রুসৈন্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছিল। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৯)

তিরন্দাজ দলকে পাহাড়ের ওপর নিযুক্ত করার পর মহানবী (সা.) আশ্বস্ত হয়ে যান এবং সারি বিন্যাস করতে থাকেন আর অফিসারদের দায়িত্ব বণ্টন করতে থাকেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা অনেক দুর্বল ছিল। সংখ্যার দিক থেকেও দুর্বল, (যুদ্ধের) সাজসরঞ্জামের দিক থেকেও দুর্বল, উত্তম অস্ত্রের দিক থেকেও দুর্বল। উভয়পক্ষে এক্ষেত্রে অনেক ব্যবধান ছিল। সংখ্যাগত দিক থেকে একজন মুসলমানের বিপক্ষে ন্যূনতম চারজন মুশরিক ছিল। অনুরূপভাবে অশ্বারোহী দলের অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও মুশরিক বাহিনী ছিল স্বতন্ত্র অবস্থানে। অধিকন্তু ইসলামী বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক বর্মহীন ছিল আর তাদের মাঝে কেবল একশ বর্ম ধারী ছিল। অথচ মক্কার বাহিনী অর্থাৎ কাফেরদের বাহিনীতে সাতশ বর্মধারী ছিল, আর এই সংখ্যা মদীনার পুরো বাহিনীর সমান ছিল।

(গাযওয়ায়ে ওহদ, প্রণেতা-মহম্মদ আহমদ বাইশমাইল, পৃ: ১০৩)

মুশরিকদের বাহিনী নিজেদের সেনাবাহিনীকে দশটি সারিতে সাজিয়ে রেখেছিল। অপরদিকে ইসলামী বাহিনীর কেবল দুটি সারি ছিল আর পঞ্চাশজন তিরন্দাজ গিরিপথ পাহারায় মোতায়েন ছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ এবং সুদৃঢ় স্থানটি মুসলমানদের দখলে ছিল।

(গযওয়াহ ওয়া সারায়া, প্রণেতা-আল্লামা মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ১৭৪)

মহানবী (সা.) সেনাবাহিনীর ডান বাহুতে হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে আর বাম বাহুতে হযরত মুনযের বিন উমর গানামীকে নিযুক্ত করেন আর জিজ্ঞেস করেন, মুশরিকদের পতাকা কে বহন করছে? উত্তর দেওয়া হয় যে, তালহা বিন আবি তালহা। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখি' এবং পতাকা হযরত আলীর কাছ থেকে নিয়ে মুসআব বিন উমায়েরকে দান করেন।

তার সম্পর্কও একই গোত্রের সাথে অর্থাৎ বনু আব্দুদ্ দার বিন কুসাই-এর সাথে ছিল যাদের মধ্য থেকে একজন কুরাইশদের পতাকাবাহক ছিল। অর্থাৎ যে গোত্রের লোক কুরাইশদের পতাকা বহন করছিল সেই একই গোত্রের মুসলমানের হাতে তিনি (সা.) নিজের পতাকা তুলে দেন। লেখক লিখেন যে, ইসলামের পূর্বে পতাকা বহনের দায়িত্ব এই বংশেরই স্কন্ধে অর্পিত ছিল, অর্থাৎ বনু আব্দুদ্ দার এর দায়িত্বে ছিল। আর প্রতিশ্রুতি পালনের অর্থ হলো কুসাই এর প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ জাতীয় বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি পালন যার সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন যে, 'আমরা প্রতিশ্রুতি পালনকারী'। আর সেদিন মুসলমানদের নারাধ্বনি বা সংকেত ছিল 'আমিত, আমিত'।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯০-১৯১) (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৮)

মহানবী (সা.) কাকুতি-মিনতির সাথে খোদা তা'লার কাছে সবিনয়ে ও বিগলিতচিত্তে বিজয় ও সফলতার জন্য দোয়া করছিলেন।

ইসলামী বাহিনীর সারিগুলোতে আনসাররা ডানে ও বামে ছিলেন। অর্থাৎ ডানদিকে ও বামদিকে মদীনার আনসাররা ছিল আর সেনাবাহিনীর মধ্যভাগ, যেখানে যুদ্ধের সময় শত্রুদের পূর্ণ জোর থাকে সেখানে মহানবী (সা.) মুহাজিরদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ তখন মধ্যভাগে তিনি (সা.) ছিলেন মুহাজিরদের সাথে। তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল ছিল দ্বিতীয় সারির পেছনে একেবারে মধ্যভাগে। তিনি (সা.) যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন তা ছিল প্রথম সারির ঠিক পেছনে দ্বিতীয় সারির মাঝখানে। তিনি (সা.) সাহাবীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, আমার পক্ষ থেকে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন আক্রমণ না করা হয়।

(গযওয়াহ ওয়া সারায়া, প্রণেতা-আল্লামা মহম্মদ আজহার ফরিদ, পৃ: ১৭৪)

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) উহুদের দিন এই দোয়া করছিলেন যে, اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যদি তুমি চাও তাহলে পৃথিবীতে (আর) তোমার ইবাদত করা হবে না।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস-১৭৪৩)

অর্থাৎ যদি তুমি সাহায্য না করো তাহলে এই অবস্থাই হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন উক্ত দোয়া করেছিলেন, সেখানেও এটি বর্ণিত হয়েছিল। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, হতে পারে উভয় উপলক্ষ্যেই তিনি (সা.) এই দোয়া করেছিলেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন।

(আল মিনহাজ শারাহ মুসলিম, প্রণেতা-নুওবী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, পৃ: ১৩৪১)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) বলেন, তুমি আমার সাথে এসো, আমরা একসাথে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করব। তারা একটি পৃথক স্থানে চলে যান। এরপর হযরত সা'দ (রা.) এভাবে দোয়া করেন যে, 'হে আমার প্রতিপালক! আগামীকাল যখন আমাদের সাথে শত্রুদের লড়াই হবে তখন আমি যেন এক শক্তিশালী যোদ্ধার মুখোমুখী হই। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে লড়াই

করব আর সে-ও যেন আমার সাথে লড়াই করে। এরপর তুমি আমাকে তার ওপর বিজয় দান কোরো। আমি যেন তাকে হত্যা করতে পারি এবং তার মালামাল আমার হস্তগত হয়।'

এরপর আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং তিনি এভাবে দোয়া করেন যে, "হে আল্লাহ্! আগামীকাল আমার লড়াই যেন এমন কারো সাথে হয়, যে হবে অনেক শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আমি যেন তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার সাথে যুদ্ধ করতে পারি আর সে আমার সাথে লড়বে। এরপর সে যেন আমাকে ধরে আমার কান ও নাক কেটে দেয়। এরপর আগামীকাল যখন আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার কান ও নাক কেন কাটা পড়েছে?' তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ্! তোমার এবং তোমার রসূলের (সা.) সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার সাথে এমনটি হয়েছে। তখন আল্লাহ্ আমাকে বলবেন, 'হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ'।" হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, 'হে আমার পুত্র! আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রা.)'র দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল। আমি সেদিনই সন্ধ্যায় আবদুল্লাহ্র কান ও নাক এক সুতায় ঝুলতে দেখেছি।'

(মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৪০৯)

অর্থাৎ শত্রুরা তার মরদেহ বিকৃত করেছিল।

[তারা উভয়ে যে যে দোয়া করেছিলেন সেসব দোয়া গৃহীত হয়। একজন শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেন, অন্যজন প্রচণ্ড লড়াই করার পর অবশেষে শহীদও হন। যাহোক এই ছিল তাদের দুজনের দোয়ার ঘটনা।]

এরপর লেখা আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম বর্ণনা করেন যে, আমি উহুদের একদিন পূর্বে মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযেরকে স্বপ্নে দেখি। তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলছিলেন- আপনি কয়েকদিনের মাঝেই আমার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় আছেন? তিনি বলেন, জান্নাতে। সেখানে যেদিকে ইচ্ছা ঘোরাঘুরি করি, [অর্থাৎ জান্নাতে]। আমি তাকে বললাম, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম এই স্বপ্নের উল্লেখ মহানবী (সা.)-এর সমীপে করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু জাবের! এটি শাহাদাতের সুসংবাদ।

(মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৪৯৭৯, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৩) (সুবুলুল হুদা , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫)

যেমন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, তার পিতা উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন।

(মারেফাতুস সাহাবা লি আবি নাঈম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৪)

এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা হয়েছে যে, মুশরিকরা সাবাখা নামক জায়গায় সারিবদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের কাছে দুইশ' ঘোড়া ছিল যেগুলো অগ্রভাগে ছিল। এরপর তারা অশ্বারোহী দলের ডান বাহুতে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও বামদিকে ইকরামা বিন আবু জাহলকে নিযুক্ত করে। আর পদাতিক বাহিনীর জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাকে,কারো কারো মতে আমর বিন আস-কে, এবং তিরন্দাজ বাহিনীর জন্য আবদুল্লাহ্ বিন আবি রাবিয়াকে নিযুক্ত করে। এরা সবাই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাদের পতাকা তালহা বিন আবি তালহার হাতে দিয়েছিল, যে আবদুদ্ দারের সদস্য ছিল। এটি সেই পতাকার ঘটনা যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, 'আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষার বেশি অধিকার রাখি'; এর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তালহা বিন আবি তালহাকে পতাকা দেওয়া হয়েছিল যে বনু আবদুদ্ দারের সদস্য ছিল। আবু সুফিয়ান বনু আবদুদ্ দারের পতাকাবাহকদের উস্কানি দিয়ে বলে, 'হে বনু আবদুদ্ দার! বদরের দিনেও তোমরাই আমাদের পতাকা বহন করেছিলে। সেদিন আমাদের যে অবস্থা হয়েছে তা তোমরা দেখেছ।

মানুষের যুদ্ধের জয়-পরাজয় তাদের পতাকাবাহকদের কারণে হয়ে থাকে। পতাকাবাহক দৃঢ় হলে মানুষের মাঝে মনোবল থাকে। যখন তারা পলায়ন করে তখন মানুষও পলায়ন করে।

[অর্থাৎ, যদি পতাকাবাহক পালিয়ে যায় তাহলে মানুষও ভয়ে পালিয়ে যায়।] অতএব, হয় তোমরা আমাদের পতাকা উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করো, অন্যথায় আমাদের পথ থেকে সরে যাও। তোমাদের স্থলে আমরাই যথেষ্ট হব।' অর্থাৎ, সে তাদের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে। তখন তারা বলে, 'আমরা কি আমাদের পতাকা তোমার হাতে তুলে দিবো? অচিরেই যখন আমাদের মোকাবিলা হবে তখন জানতে পারবে- আমরা কী!' (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯১)

সবার শেষে কুরাইশ মহিলাদের তাঁবু ছিল যেখানে তারা ক্রমাগতভাবে দাফ বাজিয়ে বদরের নিহতদের উল্লেখ করে যোদ্ধাদের উচ্ছ্বাস ও আবেগকে উদ্বেলিত করছিল এবং অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদেরকে উত্তেজিত করছিল।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৭০]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) এ বিষয়ের বিস্তারিত লিখতে গিয়ে বলেন: নিজেদের পশ্চাৎভাগ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করে মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাদলের কাতার সুবিন্যস্ত করেন এবং বাহিনীর বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিযুক্ত করেন। এ সময় তাঁকে (সা.) অবগত করা হয় যে, কুরাইশের পতাকা তালহার হাতে দেওয়া রয়েছে। তালহা সেই বংশের সদস্য ছিল যারা কুরাইশের সর্বোচ্চ পূর্বসূরী কুসায়ী বিন কিলাবের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার অধীনে যুদ্ধে কুরাইশের পতাকা বহনের অধিকার রাখতো। একথা জেনে তিনি (সা.) বলেন, "আমরা জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি। অতএব তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)'র কাছ থেকে মুহাজিরদের পতাকা নিয়ে মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে দেন যিনি সেই বংশের এক সদস্য ছিলেন, যে বংশের সদস্য তালহা ছিল।

অপর দিকে কুরাইশের সেনাদলেও কাতার সুবিন্যস্ত করা হয়ে গিয়েছিল। আবু সুফিয়ান ছিল সেনাপতি , ডান পাশের কমান্ডার ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং বাম পাশের ছিল ইকরামা বিন আবু জাহল। তিরন্দাজরা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন রবীয়্যার নেতৃত্বাধীন। মহিলারা সেনাদলের পশ্চাৎভাগে দাফ বাজিয়ে বাজিয়ে এবং রণসঙ্গীত গেয়ে পুরুষদেরকে উত্তেজিত করছিল।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৮৮)

যাহোক, উভয় দলের যখন কাতার সুবিন্যস্ত করার কাজ চলছিল তখন আবু সুফিয়ান আনসারী মুসলমানদের উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছিল, 'হে অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা আমাদের ও আমাদের বংশের লোকদের মাঝ থেকে সরে যাও। তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।' তখন আনসাররা আবু সুফিয়ানকে অনেক ভর্ৎসনা করে এবং তাকে অভিশাপ দেয়। (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩)

যথারীতি যুদ্ধ শুরু হয়। সর্বপ্রথম যুদ্ধের সূচনা করে 'ফাসেক' আবু আমের। তাকে জাহেলিয়্যাতের যুগে 'রাহেব' (তথা সন্ন্যাসী) বলে ডাকা হতো। মহানবী (সা.) তার নাম রাখেন 'ফাসেক'। এই ব্যক্তি মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা চলে যায় এবং কুরাইশকে সে বলতো, আমি যখন আমার জাতির সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করব তখন পুরো জাতি আমার সাথে এসে যোগ দিবে। [এটি তার ভুল ধারণা ছিল যে, আমি যখন তোমাদের সাথে সেখানে যাব তখন নিজের নাম উচ্চারণ করলে আনসাররা মুসলমানদের পরিত্যাগ করে আমার দলে যোগ দিবে।] যাহোক, সে তার নিজ জাতির পঞ্চাশজন সঙ্গী নিয়ে আবির্ভূত হয়। বলা হয়, তার সাথে পনেরোজন লোক মক্কা থেকে গিয়েছিল আর অন্যান্যদেরকে সে বিভিন্ন গোত্র থেকে একত্রিত করেছিল অথবা তারা মক্কাবাসীর ক্রীতদাস ছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, হে অওস গোত্রের লোকেরা! আমি আবু আমের। তখন আনসাররা বলে, হে ফাসেক! আল্লাহ্ করুন, তোর চোখ যেন প্রশান্ত না হয়। আনসারদের এই উত্তর শুনে সে বলল, আমি যাওয়ার পর আমার জাতি রাহুকবলিত হয়েছে। এরপর সে তু মু ল যুদ্ধ করে এবং তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। (সীরাতুন নবী, লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৫)

আবু আমেরের পুত্র হযরত হানযালা (রা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজ পিতাকে নিজ হাতে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৭)

[যুদ্ধাবস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত রাখতে বলেন যে, 'না, তুমি হত্যা করবে না! তাকে হত্যা করলে অন্য কেউ করবে।] অতএব আবু আমেরের পর মুশরিকদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি যে উটে আরোহিত ছিল, সে দল থেকে বেরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে। সকলে তার দিকে মনোযোগী হয়। এমনকি সে তিন বার (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে) চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তখন হযরত যুবায়ের (রা.) দল থেকে বেরিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন আর খুব জোরে লাফ দিয়ে উটে আরোহিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে তার ঘাড় চেপে ধরেন। উটের ওপরেই দুজনের ধস্তাধস্তি হয়। মহানবী (সা.) বললেন, এদের মধ্যে প্রথমে যে মাটি স্পর্শ করবে সে নিহত হবে। ইতিমধ্যে সেই মুশরিক উট থেকে নীচে পড়ে যায়, তার ওপর হযরত যুবায়ের (রা.) লাফিয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ সেই মুশরিককে হত্যা করেন। মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)'র প্রশংসা করেন এবং বলেন, "প্রত্যেক নবীর শিষ্য থাকে; আমার শিষ্য হলো 'যুবায়ের'। তিনি (সা.) আরো বলেন, 'এই মুশরিকের সাথে মোকাবেলা করার জন্য যদি যুবায়ের অগ্রসর না হতো তাহলে আমি স্বয়ং বের হতাম।' (সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০২)

যখন মানুষজনের মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হয় আর একে অপরের কাছাকাছি আসা শুরু করে তখন হিন্দা বিনতে উতবা মহিলাদের সাথে গিয়ে দাঁড়ায় আর মহিলারা দাফ বাজাতে আরম্ভ করে। তখন হিন্দা কবিতা আবৃত্তি করে বলে, 'দেখো! হে বনু আব্দুদ্ দার দেখো! নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষাকারীরা!সম্মুখে অগ্রসর হও আর তরবারির নৈপুণ্য প্রদর্শন করো। আমরা হলাম সম্মানিত ব্যক্তিদের কন্যা'। সে এগুলো গাইছিল আর পঙক্তি পড়ছিল, 'আমরা কোমল গালিচায় পদচারণা করি, আমাদের গলা মণি-মুক্তা খচিত, আমাদের সিঁথিতে কস্তুরী। যদি তোমরা সামনে অগ্রসর হও তাহলে আমরা তোমাদের বুকে জড়িয়ে নিব আর যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো তাহলে আমরা তোমাদের প্রতি রুষ্ট হব। আরএই অবজ্ঞার জন্য আমাদের কোনো পরিতাপ হবে না।' সে তাদের আবেগকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে। মহানবী (সা.) যখন এই পঙক্তিগুলো শোনেন তখন বলেন, আল্লাহুম্মা বিকা আজুলু ওয়া বিকা আসুলু ওয়া ফিকা উশাতিলু - হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই প্রদক্ষিণ করি আর তোমার নামেই আমি আক্রমণ করি তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই জিহাদ করি। আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক! (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯১-১৯২)

[এখানে তারা (অর্থাৎ কাফেররা) পার্থিব অবলম্বন ব্যবহার করছিল, এর বিপরীতে মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের অবলম্বন একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।]

যাহোক, তখন উভয় দলের মধ্যে (রক্তক্ষয়ী) যুদ্ধ শুরু হয়। সেদিন লোকেরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। আবু দু জানা আনসারী, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব,আলী বিন আবু তালিব, আনাস বিন নাযার এবং সা'দ বিন রাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীগণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের ওপর নিজ সাহায্য অবতীর্ণ করেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখান। মুসলমানরা মুশরিকদেরকে তরবারি দিয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করে এমনকি তাদের সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে। মুশরিকদের অশ্বারোহীরা মুসলমানদের ওপর তিনবার আক্রমণ করে। তখন প্রত্যেকবারই তাদেরকে তির নিক্ষেপ করে পিছু হটিয়ে দেওয়া হয়। হযরত উমর (রা.) সেদিন নিজের ভাই যায়েদ (রা.)-কে বলেন, হে আমার ভাই! আমার বর্ম পরিধান করে নাও। তখন যায়েদ (রা.) বলেন, আমিও ঠিক সেভাবে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখি যেভাবে আপনি রাখেন। তাই উভয় ভাই বর্ম পরিধান করেন নি, অর্থাৎ শাহাদতের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষায় বর্ম ছাড়াই যুদ্ধ করেছেন। সেদিন যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মহানবী (সা.) আনসারদের পতাকার নীচে বসে পড়েন আর আলী (রা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করেন যেন তিনি পতাকা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। এতে আলী (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বলেন, 'আমি হলাম আবুল কাসম।' তখন মুশরিকদের কাতার থেকে এক ব্যক্তি বের হয়, সে ছিল তালহা বিন আবু তালহা; তার হাতে মুশরিকদের পতাকা ছিল। কেননা, যুদ্ধে পতাকা বহন করার সম্মান বনু আব্দুদ্ দার গোত্রের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল। এছাড়া কুরাইশী পতাকা আব্দুদ দার গোত্রই প্রস্তুত করেছিল। তালহা বিন আবু তালহা প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে আর বলে, কে আছে যে আমার সাথে মোকাবেলা করার জন্য আসবে? সে কয়েকবার মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয় কিন্তু কেউই তার মোকাবেলায় বের হয় নি।পরিশেষে তালহা উচ্চৈঃস্বরে বলে, হে মু হাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথিরা! তোমরা তো বিশ্বাস রাখোযে, তোমাদের নিহতরা অর্থাৎ শহীদরা জান্নাতে প্রবেশ করে আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে যায়। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সে বলেছিল, হে মু হাম্মদের (সা.) সঙ্গী-সাথিরা! তোমরা বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই তোমাদের তরবারির মাধ্যমে কেটে আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন আর তোমাদেরকে আমাদের তরবারির মাধ্যমে নিহত করে তাৎক্ষণিক জান্নাতে প্রবেশ করান। তাই তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে নিজ তরবারির মাধ্যমে অতি দ্রুত জাহান্নামে পৌঁছে দিবে অথবা অতি দ্রুত আমার তরবারির মাধ্যমে নিজে জান্নাতে পৌঁছবে?! সে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করে। বলতে থাকে, লাত ও উয্যার কসম! তোমরা মিথ্যাবাদী। যদি তোমরা নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকতে তাহলে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ এই সময় আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসত। এটি শুনে হযরত আলী (রা.) তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে গেলেন। দুজনের মাঝে তরবারির আঘাত-পাল্টা আঘাত আরম্ভ হয়ে যায় আর হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন। একটিরেওয়ায়েতে রয়েছে উভয় সেনাদলের মধ্য হতে এই দুজন একে অপরের মুখোমুখি হয়। হঠাৎ হযরত আলী (রা.) তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে ধরাশায়ী করেন; তার পা কেটে ফেলেন এবং তাকে ভূপাতিত করেন। এর ফলে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়। সে সময় তালহা বলে ওঠে, হে আমার ভাই! আমি খোদার দোহাই দিয়ে তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছি। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) সেখান থেকে ফেরত আসেন এবং তার ওপর আর আক্রমণ করেন নি। এতে কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন তাকে হত্যা করেন নি? হযরত আলী (রা.) বলেন, তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সে আমার দিকে মুখ করে ছিল, এতে তার প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হয়, আর আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি তাকে কেন ছেড়ে দিলে? হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, সে খোদার দোহাই দিয়ে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়েছিল। তিনি (সা.) বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো। সে অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

মুশরিকদের পতাকাবাহীর নিহত হওয়া মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের সত্যায়ন ছিল যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি একটি ভেড়ায় আরোহিত।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) আনন্দিত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন। মুসলমানরাও আল্লাহু আকবর বললো আর মুশরিকদের ওপর এত কঠিন আক্রমণ করলো যে তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

সাহাবীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে শত্রুদের তরবারি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করতে আরম্ভ করেন এমনকি তাদেরকে সামনে থেকে সরিয়ে দেন। তালহা নিহত হওয়ার পর মুশরিকদের পতাকা তার ভাই আবু শায়বা উসমান বিন আবু তালহা নিয়ে নেয়। হযরত হামযা (রা.) তার ওপর আক্রমণ করেন, তার হাত কাঁধ থেকে কেটে ফেলেন। তার তরবারি তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত কেটে ফেলে। হযরত হামযা (রা.) তাকে হত্যা করার পরে এই কথা বলে ফেরত আসেন, আমি হাজীদের 'সাকী' (পানি সরবরাহকারী ব্যক্তি) আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এরপর মুশরিকদের পতাকা উসমান ও তালহার ভাই উঠিয়ে নেয় যার নাম ছিল আবু সাঈদ বিন আবু তালহা। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তার দিকে তির নিক্ষেপ করেন যা তার বুকে বিদ্ধ হয় আর এভাবে তাকেও হত্যা করেন। এরপর তালহা বিন আবু তালহা, যাকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করেছিলেন, তার পুত্র মুসাফেহ পতাকা হাতে নেয়; তখন হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) তাকে তির নিক্ষেপ করেন আর সে ব্যক্তিও নিহত হয়। এরপর মুসাফেহ'র ভাই হারস্ বিন তালহা পতাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এতে হযরত আসেম (রা.) তির নিক্ষেপ করে তাকেও হত্যা করেন।

তালহার এই দুই পুত্র মুসাফেহ ও হারস্-এর মা-ও মুশরিক সেনাদলে ছিল। সেই নারীর নাম ছিল সালাফা। হযরত আসেম (রা.)'র তির যাকে বিদ্ধ করত সে-ই আহত হয়ে তার কাছে ফিরত এবং মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত। সালাফা বলত, কে তোমাকে আহত করেছে? পুত্র উত্তরে বলত, আমি সেই ব্যক্তির আওয়াজ শুনেছি, সে আমাকে তির নিক্ষেপ করার পর বলেছিল, পারলে এটা সহ্য কর। আমি আবু আফলাহার পুত্র। তার মা মানত করে, যদি আসেম বিন সাবেতের মাথা আমার হস্তগত হয় তাহলে আমি এতে মদ পান করব। সে ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি আসেম বিন সাবেতের কর্তিত মাথা আমার কাছে আনবে আমি তাকে একশ উট পুরস্কার দিব। কিন্তু হযরত আসেম (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি। রাজী'র অভিযানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এই দুই ভাইয়ের নিহত হওয়ার পর তাদের তৃতীয় ভাই কিলাব বিন তালহা পতাকা বহন করে যাকে হযরত যুবায়ের (রা.) হত্যা করেন। এক উক্তি অনুযায়ী কুযমান তাকে হত্যা করেছিলেন। এরপর তার ভাই জুলাস বিন তালহা পতাকা তুলে নেয়। তাকে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) হত্যা করেন। এভাবে এই চার ভাই অর্থাৎ মুসাফেহ, হারস্, কিলাব এবং জুলাস নিজ পিতা তালহার ন্যায় সেখানেই নিহত হয়। তাদের সাথে তাদের দুই চাচা উসমান এবং আবু সাঈদও সেদিন অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের দিন নিহত হয়।

তাদের নিহত হওয়ার পর কুরাইশদের পতাকা আরতাহ্ বিন শুরাহবিল ওঠায়। তাকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করেন। এক ভাষ্য অনুসারে তাকে হযরত হামযা (রা.) হত্যা করেছিলেন। এরপর শুরাহ্ বিন কারেয পতাকা ধরলে সে-ও মারা পড়ে, কিন্তু তার হত্যাকারীর নাম জানা যায় নি। এরপর এই পতাকা আবু যায়েদ বিন আমর তুলে নেয়। তাকে কুযমান হত্যা করেন। এরপর শুরাহবিল বিন হাশেমের পুত্র পতাকা উচ্চকিত করে। তাকেও কুযমান হত্যা করেন। এরপর তাদের দাস সাওয়াব পতাকা তুলে নেয়। এই ব্যক্তি হাবশি ছিল। সে লড়াই অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে তার হাত কাটা পড়লে সে তৎক্ষণাৎ বসে গিয়ে নিজ বুক ও কাঁধের সাহায্যে পতাকা আগলে রাখে। পরিশেষে তাকেও কুযমান হত্যা করেন। এক উক্তি অনুসারে তার হত্যাকারী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আরেক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) ছিলেন। যাহোক, সকল পতাকাবাহী যখন নিহত হয় তখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালাতে আরম্ভ করে আর তাদের মহিলারা তাদের ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করতে থাকে।

{মহানবী (সা.) স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন যে, পতাকাবাহীরা নিহত হবে– তারা সবাই নিহত হয়।} মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করছিল, এমনকি তাদেরকে সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

কুরাইশ সেনাদলের সাথে আগত মহিলারাও পালাতে আরম্ভ করে। এর ফলে কুরাইশদের পরাজয়ের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। মুসলমানরা মুশরিক সেনাদলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করতে আরম্ভ করে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩-৩০৫) (সুবুলুল হুদা, উর্দু অনুবাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৮৪-১৮৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এ সম্পর্কে লিখেন, কুরাইশ সেনাদল থেকে সর্বপ্রথম আবু আমের এবং তার সাথিরা সামনে আসে। সে অওস গোত্রভুক্ত এবং মদীনার বাসিন্দা ছিল। সে রাহেব(সন্ন্যাসী) নামে সুপরিচিত ছিল। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের কিছুকাল পর এই ব্যক্তি হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে নিজের কিছু সঙ্গী-সাথিসহ মক্কা চলে যায় আর মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের উত্তেজিত করতে থাকে। সে উহুদের যুদ্ধের সময় কুরাইশদের সাহায্যকারী হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এটি একটি অদ্ভুত বিষয়, আবু আমেরের পুত্র হানযালা (রা.) একজন পরম নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে ইসলামী সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরম বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। আবু আমের যেহেতু অওস গোত্রের প্রভাবশালী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল- যেহেতু দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর আমি মদীনাবাসীদের সামনে উপস্থিত হবো তাই তারা আমার ভালোবাসায় অনতিবিলম্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পরিত্যাগ করে আমার সাথে মিলিত হবে। এই আশায় আবু আমের নিজ সঙ্গীদের নিয়ে সর্বপ্রথম সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, হে অওস গোত্রের সদস্যরা! আমি আবু আমের। আনসাররা সমস্বরে বলে ওঠেন, দূর হ হে পাপিষ্ঠ! তোর চোখ যেন কখনো শীতল না হয়। একই সাথে এমনভাবে একঝাঁক পাথর নিক্ষেপ করেন যে, আবু আমের ও তার সঙ্গীরা দিশাহারা হয়ে যায় আর পশ্চাদমুখী হয়ে ছুটে পালায়। এই দৃশ্য অবলোকন করে কুরাইশের পতাকাবাহী তালহা প্রবল উত্তেজনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে চরম অহমিকার স্বরে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাকে আহ্বান জানায়। হযরত আলী (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে দুই-চার আঘাতেই তালহাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। এরপর তালহার ভাই উসমান অগ্রসর হয় আর বিপরীত দিক থেকে হযরত হামযা (রা.) তার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেই তাকে মেরে ধরাশায়ী করেন। কাফেররা এই দৃশ্য দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে গণহামলা আরম্ভ করে। মুসলমানরাও তকবির ধ্বনি দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। বস্তুত উভয় সেনাদল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

কুরাইশের পতাকাবাহী মারা যাওয়ার পর উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে; উভয় পক্ষ থেকে দীর্ঘক্ষণ হত্যা ও রক্তপাত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইসলামী বাহিনীর সামনে কুরাইশ বাহিনী ধীরে ধীরে পিছপা হতে থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক উইলিয়াম ম্যুর লিখছেন,

মুসলমানদের জোরালো আক্রমণের সামনে মক্কাবাহিনীর পা দোদুল্যমান হতে থাকে। কুরাইশদের অশ্বারোহী দল বেশ কয়েকবার মুসলমান বাহিনীর বামবাহুর দিক থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই পঞ্চাশজন তিরন্দাজের তিরের আঘাতে তাদের পিছু হটতে হয়েছে যা মহানবী (সা.) বিশেষভাবে সেখানে তাদের মোতায়েন করিয়েছিলেন।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে উহুদের ময়দানে সেই একই বীরত্ব, সাহসিকতা এবং মৃত্যু ও বিপদের-আপদের প্রতি সেরকমই ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শিত হয়েছিল যা বদরের সময় তারা প্রদর্শন করেছিলেন।

এটি একজন ইংরেজ লেখক লিখছেন। মক্কাবাহিনীর সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছিল যখন আবু দুজানা নিজের শিরস্ত্রাণে লাল রুমাল বেঁধে তাদের ওপর আক্রমণ করছিলেন এবং মহানবী (সা.) প্রদত্ত তরবারি দ্বারা চারিদিকে যেন মৃত্যুপুরী রচনা করছিলেন। হামযা তার মাথায় উটপাখির পালকখচিত অবস্থায় সর্বত্র দৃশ্যমান ছিলেন। আলী তার লম্বা ও সাদা কাপড় নিয়ে এবং যুবায়ের তার উজ্জ্বল রঙের হলুদ পাগড়ি পরে ইলিয়াডের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের ন্যায় যেখানেই যেতেন শত্রুদের জন্য মৃত্যুবার্তা ও দুশ্চিন্তার বার্তা সাথে বহন করতেন। উইলিয়াম ম্যুর যে ইলিয়াডের কথা বলেছেন সেটি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী; সেই গ্রীক কেচ্ছাকাহিনির বীরদের কথা বলেছেন যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। যাহোক, তিনি বলেন, এটি সেই দৃশ্য যেখানে পরবতীতে ইসলামী বিজয়াভিযানের বীরসেনানীরা লালিতপালিত হয়েছে।

বস্তুত যুদ্ধ হয় আর তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অস্পষ্ট ছিল যে, বিজয়ের পাল্লা কার অনুকূলে ঝুঁকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে পরিশেষে কুরাইশদের পা দোদুল্যমান হতে থাকে আর তাদের সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের লক্ষণাবলি পরিলক্ষিত হয়। কুরাইশদের পতাকাবাহী একে একে মারা যায় এবং তাদের মাঝে প্রায় নয় ব্যক্তি পালাক্রমে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েছিল, কিন্তু সবাই একে একে মুসলমানদের হাতে নিহত হয় যেমনটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে সওয়াব নামক তালহার একজন হাবশি দাস বীরত্বের সাথে এগিয়ে এসে পতাকা হাতে নেয়, কিন্তু তার ওপরও একজন মুসলমান এসে আক্রমণ করে এবং এক আঘাতে তার উভয় হাত কেটে কুরাইশদের পতাকা ভূপাতিত করে। এদিকে সওয়াবের বীরত্ব ও স্পৃহা দেখুন! সে-ও সেই সাথে মাটিতে পড়ে যায় এবং পতাকাটিকে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে পুনরায় উড্ডীন করার চেষ্টা করে। অপরদিকে সেই মুসলমান যে পতাকা ভূপাতিত হবার মর্ম বুঝত- তরবারির আঘাতে সওয়াবকে সেখানেই হত্যা করে। এরপর কুরাইশদের মধ্য থেকে আর কারো পতাকা হাতে নেবার সাহস হয় নি। অন্যদিকে মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পেয়ে তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করে পুনরায় আক্রমণ করে এবং শত্রুদের অবশিষ্ট সারি ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে সৈন্যবাহিনীর ওপারে কুরাইশদের মহিলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে মক্কার সেনারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকে এবং চোখের পলকে ময়দান খালি হয়ে যায়; এমনকি মুসলমানদের জন্য এতটাই প্রশান্তি কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, তারা গনিমতের মাল একত্র করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ,এম.এ, পৃ: ৪৮৮-৪৯১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে স্বল্প সময়ের ভেতর সাড়ে ছয়শ মুসলমানের মোকাবিলায় মক্কার তিন হাজার সুদক্ষ সৈন্য পিছু হটে পালিয়ে যায়।

মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া আরম্ভ করে। তখন পিছনের গিরিপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা তাদের নেতাকে বলে, এখন তো শত্রুরা পরাস্ত হয়েছে, এখন আমাদেরকেও জিহাদের পুণ্য লাভের সু যোগ দেয়া হোক। নেতা তাদেরকে এরূপ করতে বারণ করে এবং মহানবী (সা.)-এর কথা স্মরণ করায়। কিন্তু তারা বলে, আল্লাহ্ র রসূল (সা.) যা বলেছেন তা কেবল তাগিদ দেওয়ার জন্য বলেছেন। নতুবা তার উদ্দেশ্য তো এটি হতে পারে না যে, শত্রুরা পিছু হটলেও তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই বলে তারা গিরিপথ অরক্ষিত ছেড়ে দেয় এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৯)

এ অবাধ্যতার কারণে কী পরিণাম হল সেটিও পরবতীতে বর্ণনা করা হবে।

আবু দুজানার তরবারি সম্পর্কে উইলিয়াম ম্যুর যা লিখেছেন সেটির বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর তরবারি নিয়ে তার প্রতি সুবিচারকারী সাহাবী কে ছিলেন- এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, 'কে আমার কাছ থেকে এটি নেবে?' তখন সবাই হাত বাড়ায় এবং বলে, 'আমি নেব, আমি নেব!' তিনি (সা.)পুনরায় বলেন, 'কে এটির প্রতি সুবিচার করার শর্তে এটি নেবে?' হযরত আনাস (রা.) বলেন, তখন সবাই থমকে যায়। তখন হযরত সিমাক বিন খারশা আবু দুজানা বলেন, 'আমি এটির প্রাপ্য প্রদানের শর্তে নিচ্ছি।' হযরত আনাস বলেন, তিনি তরবারি নেন এবং মুশরিকদের মাথা ফাটিয়ে দেন; অর্থাৎ সেটির অধিকার আদায় করেন। এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাব ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৬৩৫৩)

ইবনে উতবা লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন তরবারি দেখান তখন হযরত উমর (রা.) সেটি চান, কিন্তু তিনি (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন। অতঃপর হযরত যুবায়ের চান, তিনি (সা.) তাকেও না দিয়ে উপেক্ষা করেন। এজন্য তারা দুজন মনে মনে আক্ষেপ করেন। আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যুবায়ের তিন বার তরবারি চান। প্রতি বারই মহানবী (সা.) অস্বীকৃতি জানান। হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে সেটি নিতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, 'বসে পড়ো'।" (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯২)

অর্থাৎ তাকেও দেন নি। অপর রেওয়ায়েতে দেখা যায়, সে সময় যেসব সাহাবী সেই তরবারি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-ও ছিলেন। (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৪)

অপর এক রেওয়ায়েতে দেখা যায়, আঁ হযরত (সা.) যখন বললেন, কে এটির অধিকার প্রদানের মাধ্যমে এটিকে ব্যবহার করবে? তখন হযরত আবু দুজানা জিজ্ঞেস করেন, এর অধিকার কী?

মহানবী (সা.) জবাবে বলেন, এটি দ্বারা কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে না এবং এটি হাতে থাকা অবস্থায় কোনো কাফেরের মোকাবেলায় পলায়ন করবে না, অর্থাৎ বীরত্বের সাথে লড়াই করবে।

তখন হযরত আবু দুজানা নিবেদন করেন, আমি এ তরবারি এর প্রতি সুবিচার করার শর্তে নিচ্ছি। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু দুজানাকে তরবারি দেন তখন তিনি সেটি দিয়ে মুশরিকদের মাথা ফাটিয়ে দেন। তিনি তখন এ কবিতা পাঠ করেন,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 25 Jan, 2024 Issue No.4

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

أَنَا الَّذِيْ عَاهَدَنِيْ خَلِيْلِيْ ☆ وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ بِصفا لَدَى النَّخِيْلِ
اَنْ لَّا أَقُوْمَ الدَّهْرَ فِي الْكَيُوْلِ ☆ أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللهِ وَ الرَّسُوْلِ

অর্থাৎ 'আমি সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে আমার বন্ধু অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যখন আমরা সাফা নামক স্থানে খেজুর গাছের পাশে ছিলাম এবং সেই অঙ্গীকারটি ছিল, আমি যেন সৈন্যদলের পেছনের সারিতে না দাঁড়াই এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তরবারি দিয়ে শত্রুদের সাথে লড়াই করি।'

যাহোক, হযরত আবু দুজানা এটি নিয়ে গর্বভরে সৈন্যদলের মাঝে হঁাটতে থাকেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, اِنَّ هٰذِهٖ مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا فِيْ هٰذَا الْمُقَامِ অর্থাৎ 'এটি এমন চলন যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন কেবল এ স্থান ব্যতিরেকে' অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া।

(আল আসাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

অর্থাৎ তিনি যেভাবে হঁাটছিলেন তার কথা বলা হচ্ছে। হযরত আবু দুজানা (রা.)'র উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও সীরাত খাতামান নবীঈন (পুস্তকে) লিখেছেন, যখন মক্কার কুরাইশরা যু দ্ধে পরাজিত হচ্ছিল তখন এ দৃশ্য দেখে কাফেররা রেগে গিয়ে গণহামলা করে বসে। (তখন) মুসলমানরাও তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করে উভয় সৈন্যদল পরস্পর ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সম্ভবত সেই সময়ে মহানবী (সা.) তাঁর তলোয়ার হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এটি নিয়ে এর অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে? অনেক সাহাবী এই সম্মান লাভের আশায় নিজেদের হাত প্রসারিত করেন, যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) বরং রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।কিন্তু তিনি (সা.) কাউকে তা দেয়া হতে বিরত থাকেন আর একথাই বলতে থাকেন- কেউ কি আছে যে এর অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে? অবশেষে আবু দুজানা আনসারী (রা.) নিজের হাত সম্মুখে প্রসারিত করে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে দিন। তিনি (সা.) এই তলোয়ারটি তাকে দিয়ে দেন এবং আবু দুজানা সেটিকে হাতে নিয়ে দম্ভভরে সগৌরবে কাফেরদের দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, খোদা এভাবে হঁাটা অপছন্দ করেন, কিন্তু এমন পরিস্থিতে অপছন্দ করেন না। হযরত যুবায়ের (রা.) যিনি সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর তলোয়ার লাভের সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং নিকটাত্মীয়তার কারণে নিজের অধিকারও বেশি মনে করতেন- মনে মনে কষ্ট পেতে থাকেন আর ভাবেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে তরবারি না দিয়ে আবু দুজানাকে দেওয়ার কারণ কী! আর তার এই অস্থিরতা দূর করার জন্য তিনি মনে মনে অঙ্গীকার করেন যে, আমি এই (যুদ্ধের) প্রান্তরে আবু দুজানার সাথে সাথে থাকব আর দেখব যে, ঐ তরবারি দিয়ে তিনি কী করেন? তিনি বলেন, আবু দুজানা নিজের মাথায় একটি লাল রঙের কাপড় বঁাধেন এবং সেই তরবারি নিয়ে আল্লাহ্র প্র শংসাগীত গাইতে গাইতে মুশরিকদের ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়েন। আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি যেদিকেই যান যেন মৃত্যুপুরী রচনা করতে থাকেন। আমি এমন কোনো মানুষকে দেখি নি যে তার সামনে এসে জীবিত ফেরত গেছে। এমনকি তিনি কুরাইশ সৈন্যদলের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে সৈন্যদলের অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যান যেখানে কুরাইশদের মহিলারা দঁাড়িয়ে ছিল; আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যে চিৎকার করে করে নিজেদের (সৈন্যদলের) পুরুষদেরকে (যুদ্ধের জন্য) উদ্দীপ্ত করছিল- তার সম্মুখে পৌঁছেন এবং আবু দুজানা (রা.) নিজের তলোয়ার হিন্দার ওপর ওঠালেন। হিন্দা সজোরে চিৎকার করে নিজ (সৈন্যদলের) পুরুষদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে কিন্তু কেউই তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। কিন্তু আমি দেখলাম, হযরত আবু দুজানা নিজেই নিজের তরবারি নামিয়ে নেন এবং সেখান থেকে চলে আসেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, সেই সময় আমি আবু দুজানা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, প্র থমে তুমি তরবারি ওঠালে,আবার (নিজ থেকেই) নামিয়ে নিলে- এর রহস্য কী? তিনি বলেন, আমার মন এই বিষয়ে সায় দেয় নি যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরবারি দিয়ে একজন মহিলাকে আঘাত করব। আর মহিলাটাও এমন যার সাথে সেই সময় কোনো পুরুষ রক্ষাকারী নেই।

[এটি হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধের নীতি।]

হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি তখন গিয়ে বুঝতে পারলাম, মহানবী (সা.)-এর তরবারির প্রতি সত্যিই তিনি সুবিচার করেছেন।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৮৯-৪৯০)

সেই মহিলার ওপর তরবারি উঠিয়েও তিনি হত্যা কেন করেন নি- একজন সাহাবীর এই প্র শ্নে র প্রেক্ষিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, (সাহাবীর প্রশ্নে র উত্তরে) হযরত আবু দুজানা বলেন, আমার মন সায় দেয় নি যে, আমি মহানবী (সা.) প্রদত্ত তরবারি দিয়ে একজন দুর্বল নারীকে আঘাত করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) সর্বদা মহিলাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিতেন, যার কারণে কাফেরদের মহিলারাও অনেক ধৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করত। অর্থাৎ এই ঘটনা এজন্য সংঘটিত হয়েছিল যে, তিনি (সা.) (নারীদের) সম্মানের শিক্ষা প্রদান করতেন আর এ কারণেই মহিলারা বেশি ধৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করত, কিন্তু তারপরও মুসলমানরা সহ্য করতেন।

(তফসীর, কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২১-৪২২)

অতএব, এটিই হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধের নীতি।

অবশিষ্ট বর্ণনা আগামীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

ফিলিস্তিনীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন চরম রূপ ধারণ করছে। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন এবং অত্যাচারিত ফিলিস্তিনীদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। (আল্লাহ্ তা'লা) মুসলমান দেশসমূহকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারাঐক্যবদ্ধ হয় এবং মুসলমান ভাইদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়।

****

মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মৌলানা জয়নুদ্দীন হামিদ সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'সাহাবাগণের জীবনী- হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত নওয়াব মহম্মদ আলি খান সাহেব (রা.)।

দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মৌলানা মুনীর আহদ সাহেব খাদিম, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরাশাদ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ (আই.)-এর খুতবা ও ভাষণসমূহ থেকে লাভ হওয়ার গুরুত্ব ও কল্যাণ।

সভার তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মৌলানা সৈয়্যদ কলীমুদ্দীন সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'বা-শারাহ চাঁদা ও ওসীয়ত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও কল্যাণ।

৩০ শে ডিসেম্বর, জলসার দ্বিতীয় দিন, প্রথম অধিবেশন

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন পরিচালিত হয় মাননীয় মুনীর হাফিযাবাদী সাহেবের সভাপতিত্বে। তিলাওয়াত করেন মাননীয় লুকমান আহমদ তাকি সাহেব, জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক। অনুবাদ পেশ করেন মাননীয় মৌলানা শেখ মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী সাহেব, ম্যানেজার সাপ্তাহিক বদর,কাদিয়ান। এরপর মাননীয় দাবীর আহমদ শামীম সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন।

এই অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় হামীদুল্লাহ্ হাসান সাহেব, আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ, হায়দরাবাদ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'আহমদীয়াতের শহীদদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ।' - 'খুঁ শহীদানে উম্মত কা এ্যায়ে কম নজর/ রায়েগাঁ কব গিয়া থা কি আব জায়েগা।' (অর্থ: হে অন্ধের দল! উম্মতের শহীদদের রক্ত কবে বৃথা গিয়েছিল আর এখনও বা কেন বৃথা যাবে?)

এরপর অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মুজাফফর আহমদ নাসের সাহেব, নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'জামাত আহমদীয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যত।'

অভিমত জ্ঞাপন ও পরিচিতিমূলক বক্তব্য।

এরপর নিম্নোক্ত অতিথিবর্গ পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন। মাননীয় হাফীয বিন সালেহ সাহেব, রিজিওনাল মিনিস্টার, ঘানা। সুনারটো সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী আমুরে খারিজা, ইন্ডোনেশিয়া, মাননীয় মৌলানা সালেহ সাহেব মুরুব্বী সিলসিলা বাংলাদেশ।

এই অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় কে তারিক আহমদ সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, নুরুল ইসলাম,কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল, 'বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সতর্কবার্তা এবং ব্যাথাতুর হৃদয়ের উপদেশ; এবং জামাত আহমদীয়ার দয়িত্বাবলী। (শেষাংশ পরের সংখ্যায়.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir